শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গিয়েছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস
ড. তাপস কুমার বিশ্বাস
ড. ময়না তালুকদার
সুবর্ণা সরকার
বিপ্লব মল্লিক
ড. শিশির মল্লিক
পরিমল কুমার মণ্ডল
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
বিভোল সাহা
শাওন চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ চিত্রণ
শাওন চৌধুরী

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
আবাবিল যুল জালাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

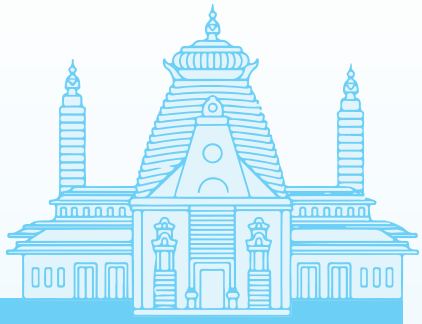

ভূমিকা

প্রিয় সহকর্মী,

সপ্তম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই!

এই শিক্ষক সহায়িকাটি আপনাকে সপ্তম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন এর সেশনসমূহ পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। এই বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং সামর্থ্যকে বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। আপনার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে এটি নতুন কিছু যোগ করবে। এই বইয়ের নির্দেশনার আলোকে কাজ করার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের হিন্দুধর্ম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের এক এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তাতে শিক্ষার্থীরা এই নূতন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সম্পূর্ণভাবে এবং সমভাবে অর্জন করতে পারবে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত হয়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় মাধ্যমিক স্তরে সপ্তম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য তিনটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষক সহায়িকাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং সার্বিকভাবে একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হবেন এই সহায়িকায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সূচিপত্র

অভিজ্ঞতার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
বিষয় পরিচিতি	১-৮
যোগ্যতা ৭.১	
শিখন অভিজ্ঞতা ১: লাইব্রেরিতে বই পড়ি	৯-১৫
শিখন অভিজ্ঞতা ২: ভূমিকাভিনয় করি	১৬-২২
যোগ্যতা ৭.২	
শিখন অভিজ্ঞতা ৩: গান করি	২৩-২৭
শিখন অভিজ্ঞতা ৪: আল্পনা আঁকি	২৮-৩৬
শিখন অভিজ্ঞতা ৫: যোগাসন করি	৩৭-৪০
যোগ্যতা ৭.৩	
শিখন অভিজ্ঞতা ৬: গল্প লিখি	৪১-৪৫
শিখন অভিজ্ঞতা ৭: শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা করি	৪৬-৫৬
শিখন অভিজ্ঞতা ৮: কমিক্স আঁকি	৫৭-৬৩

বিষয় পরিচিতি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে । নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ-হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে-যা সার্বিকভাবে হিন্দুধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান ও বিশ্বাস, জ্ঞান আহরণে আগ্রহ ও জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ
ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার জেনে ও উপলব্ধি করে চর্চা করা, ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অনুধাবন
ধর্মীয় মূল্যবোধ	প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় আচরণ গ্রহণ ও চর্চা এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জন

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও চর্চায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব যা শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।

যোগ্যতার ধারণা

জ্ঞান, দক্ষতা, ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে। চারটি উপাদানের এই সমন্বিত রূপ যোগ্যতার ধারণাকে পূর্বের শিখনফলের ধারণা থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা :

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

বিস্তারিত শিক্ষাক্রম অনুসারে হিন্দুধর্ম শিক্ষার ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য উল্লিখিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটিকে নিচের তিনটি একক যোগ্যতায় রুপান্তর করা হয়েছে-

৬.১ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা;

৬.২ হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা;

৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তারা ধারাবাহিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে; যেন তারা নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারে । অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখন সম্পন্ন হলে তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, শিক্ষার্থী তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে শিখনটা স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা বা কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন শুরু হয় একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এরপর

শিক্ষকের সামনে তার প্রতিফলন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায় শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান। এরপর শুরু হয় পরবর্তী ধাপের শিখন কার্যক্রম। শিক্ষার্থীরা নিজেরা করে, দেখে শিখে, চিন্তা করে শিখে এবং প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সচেতন, সক্রিয় ও স্বাধীন শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে। নিচে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি দেখানো হলো-

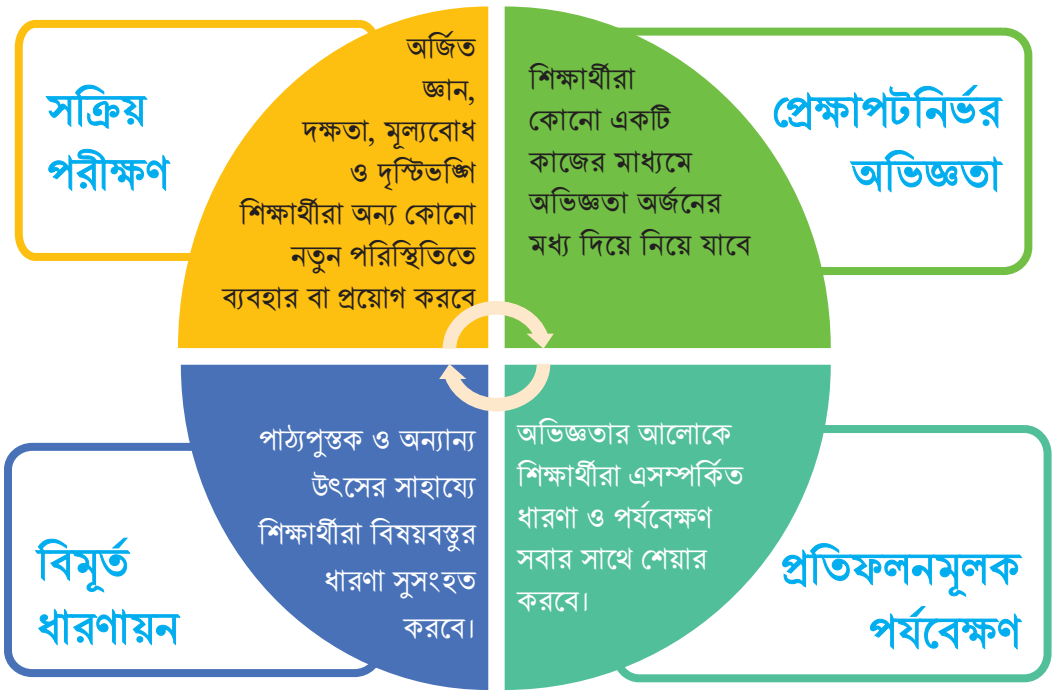

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের চারটি মূল ধাপ হলো:

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা (Concrete Experience): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বা কার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এটি শ্রেণিতে বা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে এমনকি শিক্ষার্থীরে দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনাও অভিজ্ঞতা হিসাবে আসতে পারে। এখানে তারা একক বা দলীয়ভাবে কাজটি করতে পারে।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজ বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা, পর্যবেক্ষণ, ও মতামত উপস্থাপন করে। অন্যের সঙ্গে নিজের ধারণা, মতামত ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে। এই ধাপে শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে চিন্তা করে। এ ধাপে শিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান যাচাই করার সুযোগ পান।

বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যমান ধারণার সাথে পাঠ্যপুস্তকসহ আরো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর বিষয়য়ক ধারণার সাথে তুলনা করে নিজের ধারণাকে সুসংহত করার সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করে।

সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা পূর্বের ধাপসমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দৃস্টিভঙ্গি ব্যবহার করে নতুন বা পরিবর্তিত কোনো পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে অনুশীলন করে থাকে। মূলত অর্জিত শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই হলো মিখন যোগ্যতা অর্জন করা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটানো এবং তাদের ২১শ শতাব্দীর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করানো।

শিক্ষক সহায়িকা বই এর ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলি

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতার ৪টি প্রধান উপাদান (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) স্পষ্টরূপে চিহ্নিত ও অনুধাবন করবেন।

- সকল শিখন কার্যক্রম যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘচানোর মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। হিন্দুধর্ম বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন।

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াগুলোর চর্চার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো- আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কাজভিত্তিক বা হাতে-কলমে শিখন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলীয় কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।
- হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ও গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসমূহের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শেখার সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করে এবং সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা বিকাশ করার সুযোগ দেয়। এই শিক্ষক রিসোর্স বইয়ের বিভিন্ন ধাপে যে সকল গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা (সতীর্থ মূল্যায়ন, অভিভাবক মূল্যায়ন, শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন প্রভৃতি) সংযুক্ত করা হয়েছে, আমরা আশা করছি এ নমুনাগুলো হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করবে।

সেশন

হিন্দুধর্ম শিক্ষার যে তিনটি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা বছরে ৫৬ টি সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

জেন্ডার

খেয়াল রাখবেন ছেলে-মেয়ে বা তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। ছবি আঁকার সময় ছেলেরা মেয়েদের বা মেয়েরা ছেলেদের বা কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে উপহাস বা হাস্যরস না করে। শ্রেণিতে যেন একটা পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক থাকে সে বিষয়ে আগে থেকেই গ্রাউন্ডরুলস তৈরি করে দিন। দল বা জোড়া নির্বাচনের সময় ছেলে বা মেয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাই শ্রেণির সব কাজ করবে সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। ছেলেদের বা মেয়েদের বলে আলাদাভাবে কোনো কাজ চিহ্নিত করবেন না।

ইনক্লুশন

সব শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পছন্দ (Choice) ও সামর্থ্যকে (Capability) গুরুত্ব দিন। যেমন কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি না এঁকে অন্যভাবে হাতে-কলমে প্রকাশ করতে চায় সেটিকে উৎসাহ দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি বাক্‌জনিত সমস্যা থাকে তাকে আলোচনার সময় অন্যভাবে মত প্রকাশ করতে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি শারীরিক কারণে দেয়ালে ছবি টাঙাতে অসুবিধা হয়, তাকে তার জায়গায় বসে ছবি দেখিয়ে মত প্রকাশ করতে দিন, অথবা তার অনুমতি নিয়ে আপনি নিজে বা শিক্ষার্থীদের কেউ দেয়ালে ছবিটি লাগিয়ে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মান আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা সবসময় বিবেচনায় রাখুন, যেমন কেউ ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হলে তাকে সামনে বসার ব্যবস্থা করে দিন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রমী কোনো সময়ে নতুন কোনো শিক্ষার্থী এলে তাকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে সহজ হতে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

যেহেতু এবার কোনো পরীক্ষা থাকছে না, শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আচরণ, অংশগ্রহণ, উপস্থাপন, অর্পিত কাজ, ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে শিক্ষকের পাশাপাশি সতীর্থ এবং বাবা-মা/অভিভাবকের মূল্যায়নের সুযোগ আছে। এসংক্রান্ত যাচাই তালিকা এবং রুব্রিক্সগুলো এ সহায়িকার শেষে সংযুক্ত আছে। বছরের প্রথম থেকেই শিক্ষকগণ যাতে শিখনকালীন এবং নির্দিস্ট সময়ে সামস্টিক মূল্যায়নের প্রমানক এবং তথ্যসমূহ সহজেই সংরক্ষণ করতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য 'নৈপুণ্য' নামক একটি অ্যাপ আছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে শুধু মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ নয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ট্রান্সক্রিপ্টও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যাবে। অ্যাপটি কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তার গাইডলাইন ইতোমধ্যে শিক্ষকদেরকে দেয়া হয়েছে।

শিখন উপকরণ:

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব স্কুল থেকে উপকরণগুলো সরবরাহ করতে। যেসব উপকরণ শিক্ষার্থীকে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলো যেন সহজলভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। ব্যয়বহুল উপকরণের বদলে রিসাইক্লিং, রিইউজ এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণকে গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষার্থীকে বিকল্প এবং সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। যেমন: নতুন কাগজের

বদলে পুরোনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার, প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার ইত্যাদি। শিক্ষার্থী যেন উপকরণ কেনার বদলে যথাসম্ভব আশেপাশে পাওয়া যায় এরকম জিনিস ব্যবহার করে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপকরণ কতটা জাঁকজমকপূর্ণ সেটি বিবেচনা না করে সে কতখানি যোগ্যতা অর্জন করল, কেবল সেটি বিবেচনা করবেন।

বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সহায়িকা বই কীভাবে ব্যবহার করবেন

কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা হবে তা নূতনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। পরিচিত, কোলাহলমুখর এবং প্রাণচঞ্চল সরাসরি সেশনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর একজন শিক্ষক হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনি এই সময়ে হয়তো অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন, সেশন Online হোক বা সরাসরি, শিখন-শিক্ষণের মূল দর্শন বা ভাবনা কিন্তু একই। তাই কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আপনাকে সরাসরি সেশনের অনুরূপ দক্ষতা বা সাবলীলতায় Online সেশন পরিচালনার জন্য কিন্তু প্রস্তুতি করতে হতে পারে। আর কোভিড-১৯ বা এজাতীয় কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে দেশ বা এলাকাব্যাপী লকডাউনে পুনরায় Online সেশন চালু হওয়া সম্ভবপর একটি ঘটনা। সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই প্রস্তুতি অর্জন করা ভারী গুরুত্বপূর্ণ।

এই সহায়িকা বইয়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে, বিশেষভাবে অনলাইনে কীভাবে পরিচালনা করবেন তার কিছু প্রস্তাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং আরও কিছু সক্ষমতা যেমন কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিগম্যতা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রভৃতি আপনাকে এখানে প্রস্তাবিত উপায়গুলোকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রস্তাবগুলো আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার অনুরোধ রইলো।

যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে, বলতে, দৃষ্টিসংক্রান্ত অথবা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য Online সেশন সম্পাদনে বিশেষভাবে যত্ন নিন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। কোনো কাজ সম্পাদনে অন্য শিক্ষার্থী থেকে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন। খুঁজে দেখুন বিশেষ কোনো শিক্ষা উপকরণ আছে কি না যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে। যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Screen-এর সকল Text পড়ে শোনায় এমন Application ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন একটি free application হলো NVDA (https://www.nvaccess.org)। পাশাপাশি যে শিক্ষার্থী কিঞ্চিত দেখতে পায় তার জন্য Monitor-এর Scaling level বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা দিন।

Online সেশন পরিচালনায় কিছু Application Software যেমন Zoom বা Google Classroom, এমনকি Facebook-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই Application-গুলো বেশ সহজ বা Intuitive যা আপনি হয়তো ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার করতে পারা এবং ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের জন্য পূর্বাবশ্যক। তাই Application-গুলো ব্যবহারে পারদর্শী হতে চেষ্টা করুন: এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ হলে তাতে অংশগ্রহণ করুন, You Tube-এ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সহায়ক vodeo দেখুন, বা পরিচিত কারও কাছ থেকে শিখে নিন।

প্রথম এবং প্রধান কথা হলো শিখন-শিক্ষণ একটি সামাজিক ঘটনা। তাই এটা মাথায় রাখুন Online-এ শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরের সাথে এবং আপনার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করে। এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আলোচনার আয়োজন বা অবস্থা সৃষ্টি করা। এই আলোচনা যখন প্রাঞ্জল হয়, শিক্ষার্থীরা যখন আনন্দের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তখন Online-এ সেশন সম্পাদনের যে সকল ত্রুটি আছে তা অনেকাংশে লাঘব হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো আপনার Online সেশনটি যাতে শিক্ষার্থীর জন্য আগ্রহোদ্দীপক এবং উষ্ণ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই শিক্ষক সহায়িকা বইয়ের বর্ণিত সকল সেশনগুলো এমনভাবে design করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা খুব কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ধরা দেয়। তাই এই সেশনগুলো Online-এ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি মনে রাখুন। সরাসরি সেশনের বিভিন্ন অংশগুলো Online-এ কেমন হতে পারে তার কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো।

সরাসরি সেশন	অনলাইন সেশন
আপনি বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য সরাসরি জানান	আপনি PowerPoint Presentation দেখান, সাথে বক্তৃতা বা ধারাভাষ্য দিন
আপনি শিক্ষার্থীদের Field trip-এ নিয়ে যান	শিক্ষার্থীদের যে জায়গায় নিয়ে যেতেন তার ভিডিও/ছবি দেখান
আপনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন	আপনি Online-এ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন
শিক্ষার্থী কোনো কিছু উপস্থাপন করে	শিক্ষার্থী PowerPoint-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে (যেমন Zoom-এ share screen ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ আলোচনা করে (যেমন Zoom-এ breakout ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করে	শিক্ষার্থীরা Online application -এ দলগত কাজ করে (যেমন Zoom-এ breakout room ব্যবহার করে এবং পাশাপাশি ইমেইল ও অন্যান্য application ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা কোনো লিখিত কিছু জমা দেয়	শিক্ষার্থীরা Word file বা PDF শিক্ষককে online-এ পাঠায় (যেমন ইমেইলে)

আপনার সেশনটি কীভাবে শুরু করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা আকর্ষণীয় হবে কি না তা সেশন শুরুর পূর্বে বিশেষভাবে ভেবে রাখুন। একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং খোশগল্প করার জন্য। সেশন চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করুন এবং চেষ্টা করুন class size যেমনই হোক না কেনো সবাই যাতে সেশনে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া শুনুন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করুন। দলগত কাজ দিতে পারেন (যেমন Zoom-এর breakout room ব্যবহার করে)।

Online-এ সেশন পরিচালনায় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা বা গতি নিয়ে সমস্যা না থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা চালু রাখতে বলুন। ক্যামেরা চালু রাখাটা সেশনের সকল কার্যাবলীর জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি শিক্ষার্থীরা Online সেশনে অংশগ্রহণ করছে না যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে তা বুঝতেও সাহায্য করে। Online-এ কোনো শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিন। এরকম কোনো কিছু ঘটলে সাথে সাথে থামান, এবং ব্যবস্থা নিন। উত্যক্তকারী শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলুন এবং উত্যক্তের শিকার শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করুন। Online bullying বা cyberbullying একটি ঘৃণ্য সমস্যা যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করুন।

সর্বোপরি Online সেশনকে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার অনুরোধ রইলো। এই ব্যবস্থায় video এবং অন্যান্য অনেক interactive উপকরণ ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের বদলে একটা ভিন্ন পরিবেশে মানে তার নিজের ঘরের পরিবেশে মজার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার দারুণ চমৎকার কাজটি কিন্তু আপনিই করছেন!

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ১:

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

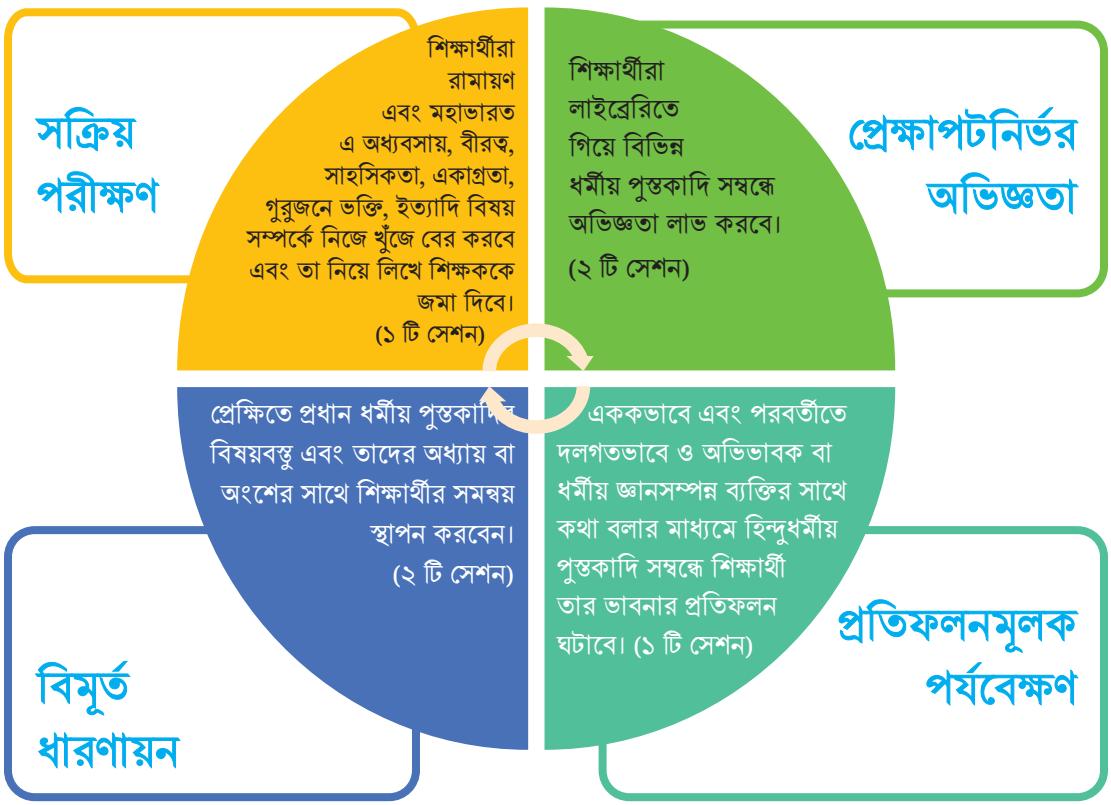

সেশন ১-২ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- আপনি শিক্ষার্থীদের একটি লাইব্রেরিতে নিয়ে যাবেন যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রধান প্রধান হিন্দুধর্মীয় পুস্তকাদি দেখতে পাবে। যদি আপনার আশেপাশে বা বিদ্যালয়ে এরকম লাইব্রেরি না থাকে তবে আপনি আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রধান প্রধান হিন্দুধর্মীয় পুস্তকাদি শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন।

- যদি এই ব্যবস্থাও না থাকে, তবে শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা তাদের বাসায় থাকা ধর্মীয় পুস্তকগুলো যাতে দেখে এবং পড়ে।

- শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে প্রধান হিন্দুধর্মীয় পুস্তকসমূহ পড়ে দেখতে সাহায্য করুন। পুস্তকগুলোর নাম বলে শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করে তাদের পুস্তকগুলো পড়তে বলুন।

- সেশন শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন যে পরবর্তী সেশনে এই লাইব্রেরির অভিজ্ঞতার কথা যাতে তারা লিখে আনে।

সেশন ৩ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের তাদের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের প্রধান পুস্তকাদি কী কী তা লিখতে বলুন।

- এবার তাদেরকে বলুন যে তারা যে পুস্তকাদি দেখলো বা পড়লো, সেখান থেকে তাদের কোন কোন বিষয় ভালো লেগেছে তা নিয়ে জোড়ায় বা দলে আলোচনা করতে।

- এই সকল আলোচনার প্রেক্ষিতে পোস্টার তৈরি করতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের পোস্টার কাগজ প্রদান করুন।

- শিক্ষার্থীদের পোস্টার উপস্থাপন করতে দিন।

- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন এবং তাদের উপস্থাপন দেখুন।

- উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন যে, লাইব্রেরির অভিজ্ঞতা, আলোচনা এবং পোস্টার উপস্থাপনের মধ্য থেকে ধর্মীয় পুস্তকাদি সম্বন্ধে এমন কিছু কি তারা জানতে পেরেছে যা সে আগে জানতো না? এরকম অজানা বা কম জানা বিষয়গুলো নিয়ে বাবা-মা/অভিভাবক বা ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে বলুন।

সেশন ৪-৫ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা যে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকাদি সম্পর্কে জেনেছে, তা আজ তারা আরও গভীরভাবে জানতে পারবে।

- এবার নিচের বিষয়বস্তু তাদের সামনে তুলে ধরুন।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। 'হিন্দু' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে অনেক কথা আছে। এখানে বহুল প্রচলিত কথাটির উল্লেখ করা হচ্ছে। একসময়ে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাস করত। প্রাচীন পারস্যবাসীরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করত। তাদের উচ্চারণে সিন্ধু হয়ে গিয়েছিল হিন্দু। আর এর অববাহিকায় যারা বসবাস করত তাদেরও বলা হতো হিন্দু । এভাবে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী 'হিন্দু' নামধারীরা হিন্দু জনগণ এবং হিন্দু সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলো। এদের আচরিত ধর্মও হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হলো। পরে এই হিন্দু জনগণ যে স্থানে গিয়েছে সে স্থানও পরিচিত হলো হিন্দুস্থান নামে। হিন্দুধর্মের আর এক নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দটি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন বা শাশ্বত। অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তা হলো সনাতন। চিরকালের বক্তব্য ও দর্শন আছে এই ধর্মে।

হিন্দুধর্মের সর্ব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। এছাড়া হিন্দুদের আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যেমন- উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি। সকল ধর্মগ্রন্থেই ঈশ্বরের কথা আছে। তবে এখানে মাত্র দুইটি ধর্মগ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।

বেদ

হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। বৈদিক যুগে মানুষের চিন্তাভাবনা, দেব-দেবী, ঈশ্বরের ধারণা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে বেদে। প্রাচীনকালে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বলা হতো ঋষি। এই ঋষিরা ধ্যান করতেন। সাধনা করতেন। এই ধ্যান ও সাধনা থেকে তাঁরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞানের কথা আছে বেদে। বেদে অনেক দেব-দেবীর কথা আছে। এঁদের বলা হয় বৈদিক দেবতা। দেবতাদের মধ্যে আছেন অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতি।

বেদ প্রথমে অবিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন। যথা - ঋগ্বেদ, সামবেদ যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ। বেদকে বিভক্ত করেছেন বলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বেদব্যাসও বলা হয়ে থাকে। চার বেদের এক একটি ভাগকে সংহিতা বলে।

ঋগ্বেদ সংহিতা: ঋক্ মানে মন্ত্র। ঋগ্বেদে ঈশ্বরের প্রাকৃতিক সত্তার শক্তিরূপে অনেক দেব-দেবীর গুণকীর্তন বা প্রশংসা ও প্রার্থনা মূলক মন্ত্র রয়েছে। মন্ত্রগুলি পদ্যে বা ছন্দে রচিত এক ধরনের কবিতা। মূলত দেব-দেবীর গুণকীর্তন বা প্রশংসামূলক মন্ত্রের সংগ্রহই হলো ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে বিশ্বামিত্র, মধুছন্দা, বামদেব, গার্গী, ঘোষা, মৈত্রেয়ী প্রমুখ বিখ্যাত।

সামবেদ সংহিতা: সাম মানে গান। যে মন্ত্র সুর দিয়ে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাকেই বলা হয় সাম। যে বেদে এ ধরনের মন্ত্র স্থান পেয়েছে তা সামবেদ। সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

যজুর্বেদ সংহিতা: ঋক্ ও সাম ব্যতীত অবশিষ্ট বেদমন্ত্র সমূহই যজুঃ নামে পরিচিত। যজুঃ মানে যজ্ঞ। যজ্ঞের অধিকাংশ নিয়ম এবং কার্যপ্রণালী যজুর্বেদে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞের সঙ্গে যে বেদের মন্ত্রের গভীর সম্পর্ক তা-ই যজুর্বেদ। যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ গদ্য ও পদ্যে রচিত। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ নামে দুই ভাগে বিভক্ত।

অথর্ববেদ সংহিতা: বেদের চতুর্থভাগ হচ্ছে অথর্ববেদ। অথর্ববেদকে প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস বলা যায়। এখানে নানা প্রকার রোগব্যধি এবং সেগুলো প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। রোগ নিরাময়ের উপায়স্বরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা-পাতা, গুল্ম প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ নামক যে চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে তারও আদি উৎস এই অথর্ববেদ। এ ছাড়া অস্থিবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে এ বেদে উল্লেখ রয়েছে।

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের বইয়ে বেদ এর উপর ভিত্তি করে একটি ঘর পূরণের কাজ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে বলুন।

উপনিষদ

বেদ পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের শেষ অংশ হলো উপনিষদ। উপনিষদ বেদান্ত নামেও অবহিত হয়ে থাকে। বেদান্ত শব্দের অর্থ হলো বেদের অন্ত বা শেষভাগ। উপনিষদ শব্দের একটি অর্থ, গুরুর নিকটে বসে নিশ্চয়ের সঙ্গে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাই উপনিষদ। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম। এখানে নিরকার ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তিনি সত্য ও চৈতন্যময়। এছাড়া আর যা কিছু রয়েছে সবই অসত্য ও জড়। সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি হচ্ছে জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

জীবের মূল সত্তা তার আত্মা। এই আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই অংশ। এই ব্রহ্ম নিরাকার। আত্মারূপে তিনি জীবের মধ্যে অবস্থান করে থাকেন। সুতরাং জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই হলো উপনিষদের বিষয়বস্তু। এই আত্মার কোনো বিনাশ নেই। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। তবে বারটি উপনিষদ প্রধান উপনিষদ হিসেবে স্বীকৃত। এ উপনিষদগুলো হলো – ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যকও কৌষিতকী।

রামায়ণ

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় গ্রন্থ হলো রামায়ণ। এতে রামের কাহিনি থাকায় এর নাম হয়েছে রামায়ণ। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা মহর্ষি বাল্মিকী। সমগ্র রামায়ণকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগকে কাণ্ড বলা হয়। কাণ্ডগুলো হলো: (১) আদি (২) অযোধ্যা (৩) অরণ্য (৪) কিষ্কিন্ধ্যা (৫) সুন্দর (৬) যুদ্ধ এবং (৭) উত্তর কাণ্ড। রামায়ণে চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে ।

অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের জীবন-কাহিনি এ গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। রাজা দশরথের তিন স্ত্রী - কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করার ইচ্ছাপোষণ করেন।

কিন্তু দাসী মন্থরার কুপরামর্শে প্ররোচিত হয়ে কৈকেয়ী দশরথের কাছে দুটি বর চান। কারণ দশরথ কৈকেয়ীর কাছে পূর্বে বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই রামের যুবরাজ হিসেবে অভিষেক হওয়ার কথা শুনে কৈকেয়ী দুটি বর দশরথের কাছে প্রার্থনা করেন। প্রথম বর হলো রামের চৌদ্দ বছর বনবাস আর দ্বিতীয়টি হলো ভরতের রাজ্যাভিষেক। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে চলে গেলেন। রামের শোকে দশরথ মারা গেলেন। বনবাস সময়ে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। বানর সেনাদের নিয়ে রাম লঙ্কা আক্রমণ করেন। রাবণকে পরাজিত করে রাম সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু প্রজাদের মঙ্গালের কথা চিন্তা করে রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাকে আবার বনবাসে পাঠালেন। সেখানে মুনির আশ্রমে সীতা আশ্রয় পেলেন এবং লব-কুশ নামে দুটি যমজ সন্তান জন্ম দিলেন। অবশেষে লব-কুশকে নিয়ে সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের বইয়ে রামায়ণ এর উপর ভিত্তি করে ঘর পূরণের একটি কাজ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে বলুন।

মহাভারত

মহাভারত একটি বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থ। হিন্দুদের কাছে মহাভারত ধর্মীয়গ্রন্থ হিসেবে অন্যতম। এটি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন। তিনি ব্যাসদেব নামে পরিচিত। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পাণ্ডবদের জয়লাভ মহাভারতের মূল কাহিনি। এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক উপকাহিনি। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব রয়েছে।

হস্তিনাপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন চন্দ্রবংশীয় শান্তনু। রাজা শান্তনুর তিন পুত্র ছিল - দেবব্রত, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। জ্যেষ্ঠ দেবব্রত বিয়ে করবেন না এবং সিংহাসনেও বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। চিত্রাঙ্গদের অকাল মৃত্যু হয়। তাই বিচিত্রবীর্য রাজা হন। তাঁর দুই পুত্র - ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তাই পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির রাজা হলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তা মেনে নিতে পারেননি। আর তখন থেকেই শুরু হয় বিবাদ। এঁরা সকলেই কুরু রাজার বংশধর বিধায় কৌরব বলা হয়। কিন্তু পাণ্ডুর সন্তানরা ক্রমে পাণ্ডব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন অনেকবার পাণ্ডবদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। পাণ্ডবদের রাজ্য-ছাড়া করার জন্য দুর্যোধন মামা শকুনিকে নিয়ে তাঁদেরকে পাশাখেলায় আহবান করেন। পাণ্ডবরা পাশাখেলায় পরাজিত হন এবং শর্ত অনুযায়ী বনবাসে যান। কিন্তু পাণ্ডবরা ফিরে এলে দুর্যোধন তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। আর তখনই শুরু হয়ে যায় উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। এটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নামে পরিচিত। আঠারো দিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। দুর্যোধনরা পরাজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ধর্মের জয় হলো আর অধর্মের পরাজয় হলো।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীকৃষ্ণের মুখঃনিসৃত অমৃতময় বাণী হলো গীতা। তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কথোপকথনের পটভূমি হলো এই গীতাগ্রন্থ। তাঁদের এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের সার গ্রন্থ। গীতা মানুষকে ধৈর্যশীল, সংযমী, নিরহংকার হতে উপদশে প্রদান করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। গীতা গ্রন্থে আঠারোটি অধ্যায় এবং সাতশত শ্লোক রয়েছে। এজন্য গীতাকে সপ্তশতী বলা হয়। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গীতা রচিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র নামক যুদ্ধের ময়দানে আঠারো দিন ব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কাহিনি গড়ে ওঠে।

যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন দুপক্ষের আপনজনদের দেখে মহাবীর অর্জুন খুব বিষণ্ন ও মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কাকে আঘাত করবেন। সকলেই যে তার প্রিয়জন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ বিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন, আত্মা জন্মরহিত, মৃত্যুহীন; আত্মাকে কোনোরূপেই ধ্বংস করা যায় না। জীবের মধ্যে আত্মা অবস্থান করে। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে দেহের ধ্বংস হলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। তাই ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা এবং অধর্মের পরাজয়ের জন্য অর্জুনের যুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো শ্রীশ্রীচণ্ডী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী চণ্ডী বা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। চণ্ডীতে সাতশত শ্লোক রয়েছে। এর জন্য একে সপ্তশতীও বলা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে শ্রীশ্রীচণ্ডী রচিত হলেও বিষয়বস্তু, শিল্পবৈশিষ্ট্য ও রচনার গুণে এটি আলাদা গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাহিনি, দেবী মহামায়া সহ নানা কাহিনির উদ্ভব ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজায় চণ্ডী পাঠ করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো চণ্ডীও প্রতিদিন পাঠ করা যায়।

দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহিষাসুরকে পরাজিত করে দেবী দুর্গা দেবতাদের মুক্ত করে তাদের স্বর্গ রাজ্য ফিরিয়ে দেন। স্বর্গ ফিরে পেয়ে তাঁরা আনন্দিত হলেন। তাঁরা দেবীর জয়গান ও স্তব-স্তুতিতে চারিদিক মুখরিত করে তোলেন।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো ’স্তুতে। ১১/১০

অনুবাদ: হে নারায়ণি, হে গৌরি, তুমি সর্বপ্রকার কল্যাণদায়িনী, সকল প্রকার সুফল প্রদায়িনী, আশ্রয়স্বরূপা, ত্রিনয়না তোমাকে বার বার নমস্কার জানাই।

- শিক্ষার্থীদের নিচের মিলকরণটি করতে দিন। শিক্ষার্থীদের বইয়েও এই মিলকরণটি দেওয়া আছে।

বেদ	মহর্ষি বাল্মিকী
উপনিষদ	মোট আঠারোটি পর্ব

রামায়ণ	শ্রীকৃষ্ণের মুখঃনিসৃত অমৃতময় বাণী
মহাভারত	হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	বেদান্ত
শ্রীশ্রীচণ্ডী	লোকনাথ ব্রহ্মচারী
	মার্কণ্ডেয় পুরাণ

সেশন ৬ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, রামায়ণ এবং মহাভারত তাদের কেমন লেগেছে।

- তাদেরকে এবার বলুন যে রামায়ণ এবং মহাভারত থেকে নিম্নলিখিত গুণের উপর ভিত্তি করে একটি সচিত্র রচনা লিখতে হবে। (কাজটি আগের সেশনে বাড়িতেও করতে দিতে পারেন। এটি নিশ্চিত করবেন যেন শিক্ষার্থী কারোর সাহায্য ছাড়া একা কাজটি করে।)
    - অধ্যবসায়
    - বীরত্ব
    - সাহসিকতা
    - একাগ্রতা
    - গুরুজনে ভক্তি

- শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া সচিত্র রচনাগুলো শ্রেণিকক্ষের চারপাশে টাঙিয়ে দিন।

- শিক্ষার্থীদের এবার বলুন টাঙানো একে অপরের রচনাগুলো যাতে তারা মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং পড়ে।

- শিক্ষার্থীদের একে অপরের রচনা দেখা শেষ হলে তাদের কাজের জন্য প্রশংসা করুন এবং ধন্যবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের জানান যে এই রচনাগুলো এখন সুন্দর করে বাঁধাই করে লাইব্রেরিতে রাখা হবে যাতে অন্যান্যরাও এই রচনাগুলো পড়তে পারে।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ২:

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞ-তাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৭ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

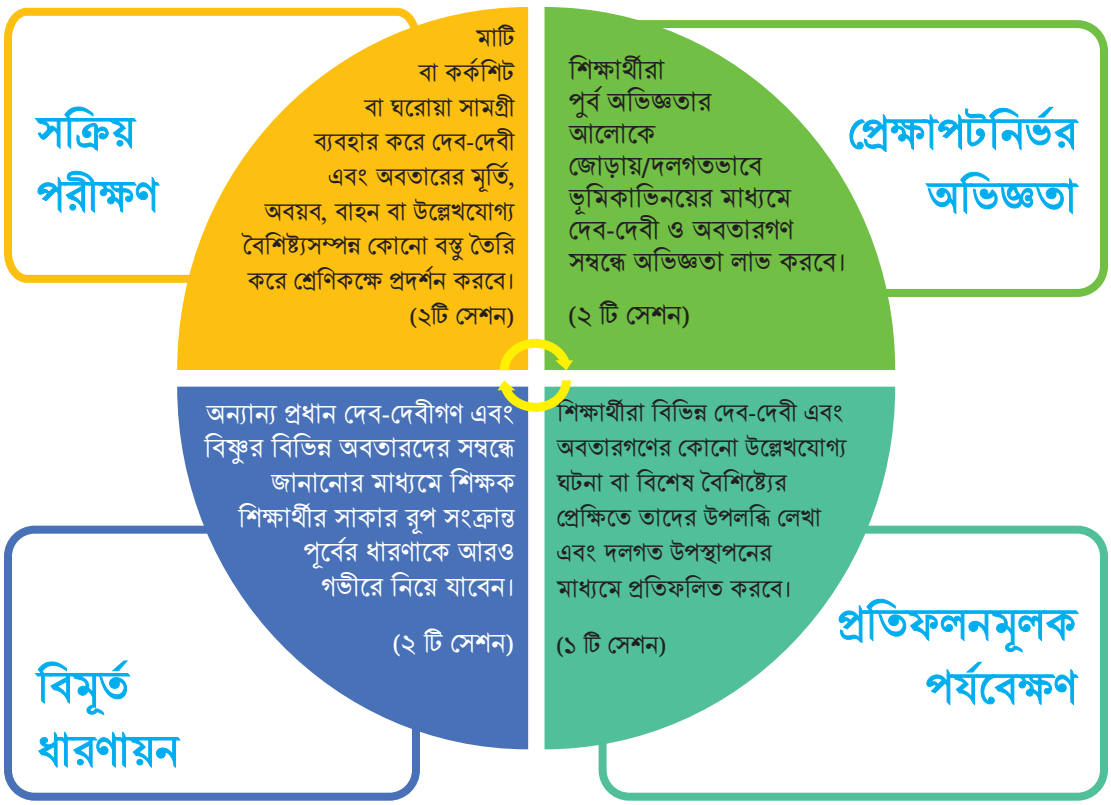

সেশন ১-২ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষার্থীদের তাদের পূর্বজ্ঞানের সাপেক্ষে যেকোনো দেব-দেবী বা অবতার রূপে জোড়ায়/দলগতভাবে ভূমিকাভিনয়ের জন্য বলুন।
- শিক্ষার্থীরা কোন দেব-দেবী বা অবতারের ভূমিকাভিনয় করবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কিছু-ক্ষণ সময় দিন।

- শিক্ষার্থীরা প্রথমে কোন দেব-দেবী বা অবতারের ভূমিকাভিনয় করবে তা মুখে বলবে। এই অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীরা জোড়ায় বা দলগতভাবে তাদের ভূমিকা নিজেরাই ঠিক করে নিবে। অতঃপর শিক্ষার্থীদের পছন্দকৃত দেব-দেবী বা অবতারের ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাবে।

- যেহেতু শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ভূমিকাভিনয় করবে তাদের ভূমিকাভিনয়ের পোশাক বা সাজ-সজ্জা না থাকা স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীরা যাতে ভূমিকাভিনয়ে কোনো বিশেষ ঘটনা বা ভঙ্গি বা গল্প ফুটিয়ে তুললো কি-না সে বিষয়টি লক্ষ করুন।

সেশন ৩ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষার্থীরা যে দেব-দেবী বা অবতারের ভূমিকাভিনয় করেছে সে দেব-দেবী বা অবতারের বিষয়ে তারা যা জানে তা তাদের বইয়ের নির্দিষ্ট স্থানে লিখবে। (আগের সেশন শেষে কাজটি বাড়িতে করতে দিতে পারেন।)

- জোড়ায় ভাগ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখার মিল-অমিল দেখতে বলুন।

- প্রত্যেক জোড়াকে বলুন, তাদের লেখার উপর ভিত্তি করে ছন্দ বা অন্ত্যমিল আছে এমন নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করতে। উদাহরণের মতো করে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অন্ত্যমিল শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন:
    - অবতার - সাকার
    - কৃষ্ণ - উষ্ণ
    - কালি- ডালি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, দেব-দেবী ও অবতারগণকে নিয়ে তাদের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অপর শিক্ষার্থীর আবৃত্তি মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের তাদের কাজের জন্য প্রশংসা করুন এবং ধন্যবাদ জানান।

সেশন ৪-৫ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষার্থীদের বলুন, "তোমরা এই যে দেব-দেবী অবতারগণকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছো, চলো আমরা আমাদের হিন্দুধর্মের আরও কয়েকজন দেব-দেবী এবং অবতারগণ সম্বন্ধে জানি।"

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর নিরাকার ব্রহ্ম রূপে সর্বত্র বিরাজমান। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে অনুভব করি। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের বিশেষ কোনো গুণ বা শক্তির সাকার রূপ হলো দেবতা বা দেব-দেবী। তাই হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা ঈশ্বরের সাকাররূপী বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। এছাড়াও ঈশ্বর দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য জীবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। তাঁর এই আসা বা অবতরণ করাকে বলা হয় অবতার।

ঈশ্বরের সাকার রূপ: দেব-দেবী

বিশ্বকর্মা দেবতা

বিশ্বকর্মা দেব বিশ্বভুবনের স্থপতি। শিল্প ও পুরকৌশলের দেবতা। শিল্পনৈপুণ্য, স্থাপত্যশিল্প এবং কারুকার্য সৃষ্টিতে অনন্য গুণশালী দেবতা তিনি। পুরাণ অনুসারে তিনি দেবশিল্পী। তিনি স্থাপত্য বেদ নামে একটি উপবে-দের রচয়িতা। বিশ্বকর্মা দেবের চার হাত। তাঁর বাম দিকের এক হাতে আছে ধনুক আর এক হাতে তুলাদণ্ড। ডান দিকের এক হাতে হাতুড়ি অন্য হাতে আছে কুঠার। তার বাহন হাঁস। তাঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। তিনি অলংকার শিল্পের স্রষ্টা। দেবতাদের বিমান ও অস্ত্রনির্মাতা। তিনি পুষ্পকরথ, শিবের ত্রিশূল, ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, কুবেরের অস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীও নির্মাণ করেছেন।

ভাদ্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মার পূজা করা হয়। সূতার-মিস্ত্রিদের মধ্যে এঁর পূজার প্রচলন সর্বাধিক। তবে বাংলাদেশে স্বর্ণকার, কর্মকার, কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও বিশ্বকর্মার পূজা করে থাকেন।

জগদ্ধাত্রী দেবী

জগদ্ধাত্রী দেবী দুর্গার একটি রূপ। বাঙালি হিন্দুসমাজে দেবী দুর্গা ও কালীর পরেই দেবী জগদ্ধাত্রীর স্থান ।

জগদ্ধাত্রী শব্দের আভিধানিক অর্থ জগতের ধাত্রী বা পালিকা। জননীরূপে তিনিই বিশ্বপ্রসূতি, আবার ধাত্রীরূপে তিনিই বিশ্বধাত্রী।

জগদ্ধাত্রী দেবী ত্রিনয়না। দেবীর গাত্রবর্ণ উদীয়মান সূর্যের ন্যায়। তাঁর চার হাত। বাম দিকের দুই হাতে আছে শঙ্খ ও ধনুক। ডান দিকের দুই হাতে আছে চক্র ও বাণ। গলায় সর্পপৈতা। রক্তলালবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এ দেবীর বাহন সিংহ। হাতির পিঠে তিনি অবস্থান করেন। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শীতলা দেবী

শীতলা হিন্দুদের একজন দেবী। তিনি একজন লৌকিক দেবী। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, বাংলাদেশে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। তিনি বসন্ত, ঘা, ব্রণ, ফুস্কুড়ি প্রভৃতি রোগ নিরাময় করেন। অপদেবতার হাত থেকেও তিনি রক্ষা করেন। শীতলা দেবীর গায়ের বর্ণ শুভ্র। তাঁর বাহন গর্ভ বা গাধা। শীতলা দেবীর এক হাতে থাকে জলের কলস, অন্য হাতে থাকে সম্মার্জনী বা ঝাড়ু। ভক্তদের বিশ্বাস, কলস থেকে তিনি আরোগ্য সুধা দান করেন। ঝাড়ু দ্বারা রোগাক্রান্তদের কষ্ট লাঘব করেন। সকল অমঙ্গল দূর করেন।

দোল পূর্ণিমার পর অষ্টমী তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। এই তিথিটি শীতলাষ্টমী নামে পরিচিত। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে গ্রামের মানুষ শীতলা পূজা করে থাতক।

শীতলা পূজায় আমাদের দেহমন শীতল হয়। মনে শান্তি আসে।

- শিক্ষার্থীদের এবার নিচের ঘরগুলো পূরণ করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বইয়েও এটা দেওয়া আছে। (কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।)

দেব-দেবী	দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য	আরাধনার কারণ	বাহন	পূজার সময়
বিশ্বকর্মা দেবতা				
জগদ্ধাত্রী দেবী				
শীতলা দেবী				

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, "অবতারগণ কেনো পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তোমরা কি কেউ জানো?" শিক্ষার্থীদেরকে এবার তাদের ভাবনা নিজ বইয়ে নির্ধারিত জায়গায় লিখতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, "তোমরা ঠিকই বুঝেছো, অবতারগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। গত বছর তোমরা কয়েকজন অবতার সম্বন্ধে জেনেছিলে, চলো, এখন আমরা আরও কয়েকজন অবতারগণ সম্বন্ধে জানি।"

অবতার

মাঝে মাঝে পৃথিবীতে খুব অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মানুষ ভালো পথ থেকে খারাপ পথে চলে যায়। ধর্মের পথ থেকে চলে যায় অধর্মের পথে। অধার্মিক ও দুষ্ট লোকেরা প্রবল হয়ে ওঠে।

ধার্মিকদের জীবনে নেমে আসে নিপীড়ন ও নির্যাতন। এরূপ অবস্থায় ভগবান বিষ্ণু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন। তিনি মানুষ বা অন্য কোনো জাগতিক রূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁর সেই জাগতিক রূপকে অবতার বলা হয়।অবতার দুই প্রকার পূর্ণাবতার ও অংশ অবতার। বিষ্ণু পূর্ণ-ভাবে অবতীর্ণ হলে তাঁকে পূর্ণাবতার বলে। অংশরূপে অবতীর্ণ হলে তাঁকে অংশ অবতার বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান। তাই পূর্ণাবতার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। দশ জন অংশ অবতারের কথা বিশেষভাবে জানা যায়। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা চার জন অবতারের পরিচয় জেনেছি। এখানে অবশিষ্ট ছয় জন অবতারের পরিচয় দেওয়া হলো:

বামন অবতার

ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার হল বামনাবতার। দৈত্যরাজ বলিকে দমন করার জন্য শ্রীহরি বামনরূপে সত্য যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একসময় প্রহ্লাদের নাতি দানবরাজ বলি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবলোক থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দেন। দেবতারা এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর আরাধনা শুরু করেন। তাঁদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হন ভগবান বিষ্ণু। তিনি বলির হাত থেকে দেবতাদের রক্ষার অঙ্গীকার করেন। তখন শ্রীহরি বামন বা খর্বাকার রূপ ধারণ করেন। দৈত্যরাজ বলি তখন এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি প্রচার করেন, এই যজ্ঞে তাঁর কাছে যে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দিবেন। এই সুযোগে বামনদেব বলির কাছে প্রার্থী হয়ে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি চাইলেন। অর্থাৎ তিনটি পা ফেলার মতো জায়গা। এ কথা শুনে দানবরাজ হেসে উঠলেন। ক্ষুদ্রাকায় বামনের তিন পা পরিমাণ ভূমি খুবই সামান্য ব্যাপার। তিনি বামনের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তখনই বামনদেবের তিন পা হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে গেল। তিনি

তার প্রথম পা পৃথিবীতে রাখলেন। দ্বিতীয় পা স্বর্গে রাখলেন। তাঁর নাভির দিক থেকে আর একটি পা বের হলো। এই তৃতীয় পা তিনি কোথায় রাখবেন? তখন দৈত্যরাজ বলি কী করবেন! তিনি বামনকে কথা দিয়েছেন। কথা রাখতে হবে। কোনো উপায় না দেখে তিনি তার নিজের মস্তক এগিয়ে দিলেন। বামন বলির মস্তকে তৃতীয় পা রাখলেন। এভাবে বামনরূপে ভগবান বিষ্ণু বলিকে দমন করলেন। দেবতারা দেবলোক ফিরে পেল। সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হলো।

পরশুরাম অবতার

পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার । 'পরশুরাম' নামের আক্ষরিক অর্থ কুঠার হস্তে রাম। তখন ত্রেতা যুগ। এই সময় ক্ষত্রিয় রাজারা প্রবল শক্তিশালী হয়েছিল।তাঁরা অত্যাচারী হয়ে উঠল। ক্ষত্রিয় রাজাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রজারা ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। তাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু-দেব ভগবান পরশুরাম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরশুরামের পিতার নাম জমদগ্নি, মাতা রেণুকা। তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন এবং হাতে তুলে নেন পরশু বা কুঠার নামক এক বিশেষ অস্ত্র। তখন থেকেই তাঁর নাম হয় পরশুরাম । পরশুরাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করেছেন। যুদ্ধ করেছেন। তিনি একুশবার এ পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে শান্তি স্থাপন করেছিলেন।

রাম অবতার

রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। তিনি ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথ এবং কৌশল্যার পুত্র। রাম চন্দ্র ছিলেন অশেষ গুণের অধিকারী।

আমরা রামায়ণ থেকে রামের কথা জানি। রামের স্ত্রীর নাম সীতা। পিতার দেয়া শর্ত রক্ষা করার জন্য তিনি স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণকে নিয়ে বনে যান । এই সময় লংকার রাজা ছিলেন রাবণ। রাবণ ছিলেন রাক্ষসদের রাজা। তিনি খুবই অত্যাচারী এবং শক্তিশালী ছিলেন। দেবতাদেরও তিনি পরাজিত করেন। তাঁর অত্যাচারে পৃথিবীতে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়। একসময় রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। রামচন্দ্র বানর সৈন্যদের নিয়ে রাবণকে সবংশে বিনাশ করেন এবং স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করেন। পৃথিবী রাক্ষসমুক্ত হয়। রাবণের মৃত্যুতে সর্বত্র শান্তি ফিরে আসে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রামচন্দ্র ছিলেন সত্যের রক্ষক, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল রাজা। তাঁর শাসনে প্রজারা খুব সুখী ছিলেন ।

- শিক্ষার্থীদের এবার নিজের বইয়ে দেওয়া নির্ধারিত অংশে ওপরে আলোচিত তিনজন অবতার সম্বন্ধে লিখতে বলুন।

বলরাম অবতার

ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হলেন বলরাম। তিনি বলভদ্র নামেও পরিচিত।তাঁর পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণী। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই।

তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল'হল' বা 'লাঙ্গল'। তাই তিনি হলধর নামেও পরিচিত।তখনকার দিনে যমুনা নদী বৃন্দাবন থেকে বেশ কিছুটা দূর দিয়ে প্রবাহিত হতো। ফলে কৃষকদের কৃষিকাজ করতে বেশ পরিশ্রম করতে হতো। বলরাম তাঁর লাঙ্গল দিয়ে মাটি খুঁড়ে যমুনাকে বৃন্দাবনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এতে বৃন্দাবনবাসীদের অনেক সুবিধা হয়। তিনি জগৎকে এই বার্তা দিয়ে গেছেন যে, দলনিরপেক্ষ ও গোষ্ঠিনিরপেক্ষভাবে সকল কৃষককে

কৃষির মাধ্যমে দেশের কাজে নিয়োজিত হতে হবে। তিনি কৃষকদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অনন্ত আর্শীবাদ। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি অনেক অত্যাচারীকে শাস্তি দিয়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনা করেন। তিনি বাল্যকালে ধেনুকাসুর ও প্রলম্ব অসুরকে হত্যা করেন। তিনি এবং তাঁর ছোট ভাই শ্রীকৃষ্ণ মিলে অত্যাচারী কংস রাজাকে হত্যা করেন। কংস এবং তাঁর অনুসারীদের মৃত্যুতে সমাজে শান্তি ফিরে আসে।

বুদ্ধ অবতার

বুদ্ধদেব শ্রীবিষ্ণুব নবম অবতার। ভগবান বুদ্ধদেবকে শান্তি এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বুদ্ধ-দেব ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধধন এবং মাতার নাম মায়াদেবী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁর আরে এক নাম গৌতম। তিনি এক সময় স্ত্রী পুত্র ছেড়ে সংসার ত্যাগ করেন।

ছোট বেলা থেকে মানুষের বার্ধক্য, অসুস্থতা, মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি খুব চিন্তিত হন। এর থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এটাই তাঁর চিন্তা। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি দুঃখের কারণ থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে ৩৫ বছর বয়সে তিনি বোধি অর্জন করেন। বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য তার নাম হয় বুদ্ধ। তাঁর অনুসারীদের বলা হয় বৌদ্ধ।

দুঃখবিদ্ধ মানুষের যন্ত্রণা দুর করা এবং অকারণে প্রাণী হত্যা বন্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর মতে প্রাণী হত্যা মহাপাপ। প্রত্যেক প্রাণী তার নিজের জীবনকে ভালোবাসে তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত দেওয়া বা হত্যা করা যাবে না। তিনি মানুষকে হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের সময় সমাজে অনেক খারাপ অবস্থা ছিল। তিনি সমাজের অনেক কুসংস্কার দূর করেন। জাতিভেদ,বর্ণভেদ দূর করেন। তিনি মানুষের সদাচরণ ও সৎ চিন্তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সকলের মধ্যে মনুষত্ববোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ গ্রহণ করলে সমাজে হিংসা বিদ্বেষ থাকবনা। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে।

কল্কি অবতার

হিন্দুধর্ম অনুসারে কল্কিদেব বিষ্ণুর দশম অবতার। তিনি কলি যুগের অবসান ঘটাবেন। কলিযুগ হলো চার যুগের শেষ যুগ। কলিযুগে অধর্ম খুব বেড়ে যাবে। কলিযুগের শেষে সমাজে ক্ষমতাবান দুষ্ট লোকেরা আসুরিক আচরণ করবে এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হবে। এ সময় ভগবান বিষ্ণু কল্কি অবতাররূপে এই পৃথিবীতে আসবেন। তিনি বিষ্ণুযশ ও সুমতির পুত্ররূপে সম্ভল নামক এক গ্রামে জন্ম নেবেন। তিনি কলিযুগের শেষে জন্মনেবেন। তখন এই পৃথিবীর অল্পসংখ্যক মানুষ ব্যতীত সকলেই ধর্মকে ভুলে যাবে। ভালো মানুষদের নিয়ে লোকে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করবে। লোকগুলো ভালো লোকদের পশুর মতো মারবে। গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে নরকে পরিণত হবে। ঠিক তখনই মহাশক্তিশালী, ক্ষমতাধর এবং মহানুভব কল্কিদেব অবতীর্ণ হবেন। তিনি দেবদত্ত নামক একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে হাতে তরবারি নিয়ে সমস্ত অন্যায়কারীকে বিনাশ করবেন। দুষ্ট ও অধার্মিক মানুষদের ভয়ানক প্রভাব থেকে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করবেন। পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে আসবে। শুরু হবে সত্যযুগের।

- শিক্ষার্থীদের এবার নিজের বইয়ে দেওয়া নির্ধারিত অংশে ওপরে আলোচিত তিনজন অবতার সম্বন্ধে লিখতে বলুন। (কাজটি বাড়িতেও করতে পারে।)

- শিক্ষার্থীদের এবার নিজের ছকটি পূরণ করতে দিন। শিক্ষার্থীদের বইয়েও এটা দেওয়া আছে।

অবতারগণ	বিষ্ণুর কততম অবতার	মানবকল্যাণে করা কাজ
বামন অবতার		
পরশুরাম অবতার		
রাম অবতার		
বলরাম অবতার		
বুদ্ধ অবতার		
কল্কি অবতার		

সেশন ৬-৭ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের দেব-দেবী এবং অবতারগণকে নিয়ে দারুণ সৃজনশীল এবং মজার একটি কাজ করতে হবে।
- বলুন যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরবর্তী সেশনে মাটি বা কর্কশিট বা ঘরোয়া সামগ্রী ব্যবহার করে দেব-দেবী বা অবতারের মূর্তি, অবয়ব, বাহন বা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো বস্তু তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিন এবং আপনি নিজে মাটি বা কর্কশিট বা ঘরোয়া সামগ্রী ব্যবহার করে কোনো কিছু তৈরি করে দেখান । যেমন মাটি ব্যবহার করে শীতলা দেবীর জলের কলস অথবা কাগজ দিয়ে রাবণের মাথা তৈরি করে দেখাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের এই শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষকের সহায়তা নিতে বলতে পারেন।
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা দেব-দেবী বা অবতারের মূর্তি, অবয়ব, বাহন বা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তুগুলো দিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন। শিক্ষার্থীদের তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করুন এবং ধন্যবাদ জানান।
- লক্ষ রাখুন এবং বিশেষ যত্ন নিন যাতে কোনো শিক্ষার্থী দেব-দেবীর কোনো হাতিয়ার বা অস্ত্র তৈরি করে আনলে ঐ অস্ত্র যাতে কাউকে আঘাত দিতে না পারে।
- প্রদর্শনী শেষে শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক সৃষ্টিগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা: ৩

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা-চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

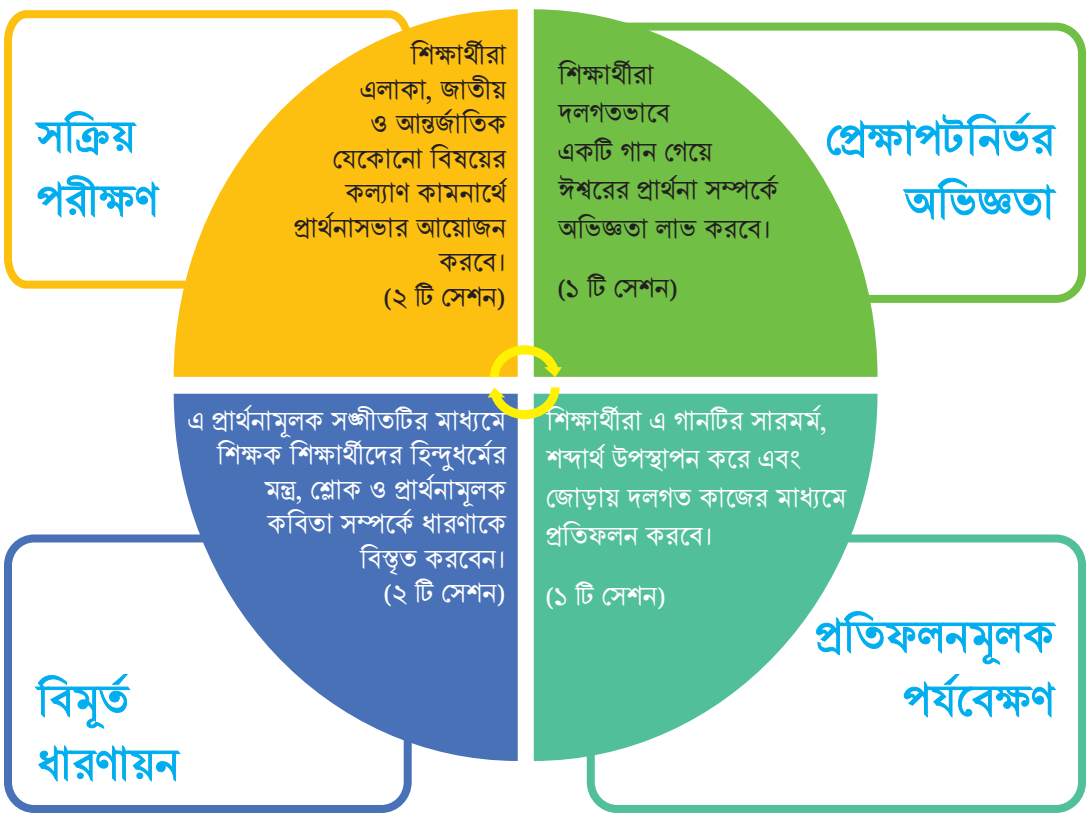

সেশন ১ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নীচের প্রার্থনামূলক গানটি গাইবে।

  বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।

  বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

  দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,

  দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥

  সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,

  সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা

  নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

  আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।

  তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

  আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,

  বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

  নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে।

  দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা

  তোমারে যেন না করি সংশয়।

- গানটি প্রথমবার গাওয়ার পরে শিক্ষার্থীরা কিছুক্ষণ রিহার্সাল করে পুরো গানটি সমস্বরে আবার করবে।
- বাড়িতে গিয়ে তারা এরকম প্রার্থনাসঙ্গীত আরও খুঁজবে। প্রয়োজনে অভিভাবকের সাহায্য নেবে।

সেশন ২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে তাদের বইয়ে দেওয়া গানটির সারমর্ম নিজেরা লিখবে।
- শিক্ষক তাদেরকে সহায়তা করবেন। শিক্ষক তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। যেমন:
  - এই গানটির মাধ্যমে তোমরা কী বুঝতে পারছো?

- এখানে কার কাছে শক্তি প্রার্থনা করা হচ্ছে?
- কেন শক্তি প্রার্থনা করা হচ্ছে?

- এ প্রশ্নগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীরা সারমর্ম লেখার সময় কোনো সমস্যা হলে শিক্ষক তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভিতর থেকে বিভিন্ন ভাবনা তুলে আনবেন।
- সারমর্ম লেখা হলে প্রত্যেক জোড়া/ দল শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
- অন্য শিক্ষার্থীরা এই উপস্থাপনের যদি কোন সংযোজন-বিয়োজনের বিষয় থাকে, তাহলে সেটা নোট করবে। শিক্ষক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন, যাতে সবাই অংশগ্রহণ করছে।

সেশন ৩-৪ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষক গানটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঈশ্বর, প্রার্থনা, প্রভৃতি সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে, তার সাথে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মন্ত্র, শ্লোক, কবিতা, এগুলো নিয়ে আরও গভীর ধারণা দেবেন।

মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা

বেদ

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।।

ঋগ্বেদ ১০/৯০/১

শব্দার্থ: সহস্রশীর্ষা - হাজার মস্তক, পুরুষঃ - পরম পুরুষ বা ঈশ্বর, সহস্রাক্ষঃ (সহস্র+অক্ষঃ) - হাজার চক্ষু, সহস্রপাৎ হাজার পা বা চরণ, স - তিনি, ভূমিং - ভূমি, বিশ্বতো - জগৎ বা পৃথিবী, বৃত্বা - ব্যাপ্ত করে বা অতিক্রম করে, অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ (অতি+অতিষ্ঠৎ+দশ+অঙ্গুলম্) - দশ অঙ্গুলি অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

সরলার্থ: তাঁর পরম পুরুষ বা ঈশ্বরের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি জগৎকে সর্বত্র অতিক্রম করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

উপনিষদ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ।।

শব্দার্থ: ঈশা - ঈশ্বরের দ্বারা; বাস্যম্ - আচ্ছাদিত বা বাসের নিমিত্ত; ইদম - এই; সর্বম্ - সমস্ত; যৎ কিঞ্চ জগত্যাম্ - যা কিছু জগতে; জগৎ - চলমান; তেন - তার দ্বারা; ত্যক্তেন - ত্যাগের সঙ্গে; ভুঞ্জীথা - ভোগ করবে; মা - না; গৃধঃ - লোভ; কস্যস্বিদ ধনম্ - কারও ধনে।

সরলার্থ: এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু চলমান বস্তু আছে, তা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত মনে করবে। ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করো না।

শ্রীমদভগবদ্গীতা

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। (৪/৩৯)

শব্দার্থ: শ্রদ্ধাবান্ - শ্রদ্ধাশীল; লভতে - লাভ করেন; জ্ঞানম্ - জ্ঞান; তৎপরঃ - নিপুণ; সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযত ইন্দ্রিয়ঃ) - জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি; জ্ঞানং লব্ধা - জ্ঞানলাভ করে; পরাম্ - পরম; শান্তিম্ - শান্তি; অচিরেণ - শীঘ্র; অধিগচ্ছতি - পেয়ে থাকেন।

সরলার্থ: শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে থাকেন। জ্ঞান লাভ করার পর শীঘ্র তিনি পরম শান্তি পেয়ে থাকেন।

শ্রী শ্রী চণ্ডী

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।

ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ।। (১১/৭)

শব্দার্থ: সর্বভূতা – সর্বস্বরূপা; যদা – যখন; দেবী – দেবী; স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী – স্বর্গ এবং মুক্তিদানকারিণী; ত্বং – তুমি; স্তুতা – তোমার স্তব করলে; স্তুতয়ে – স্তবের জন্য; কা বা – কিছুই বা; ভবন্তু – হবে বা হতে পারে; পরমোক্তয়ঃ– শ্রেষ্ঠ বা পরম বাক্য।

সরলার্থ: তুমি সর্বস্বরূপা দেবী, তুমি স্বর্গ এবং মুক্তি দান করে থাক। কাজেই তোমাকে স্তব করতে হলে কোন শ্রেষ্ঠ বা পরম বাক্য তোমার স্তবের জন্য যোগ্য হবে।

প্রার্থনামূলক কবিতা

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব, পূণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্, মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকুল-গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও, রুধিয়া পন্থা;
তব, শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস, মোর মত্ত-বাসনা ঘুচায়ে!
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকুল-গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও, রুধিয়া পন্থা;
তব, শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস, মোর মত্ত-বাসনা ঘুচায়ে!

রজনীকান্ত সেন

সেশন ৫-৬ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যে প্রার্থনাসভাটি আয়োজন করবে তার জন্য প্রথমে তারা শিক্ষকের সহায়তায় একটি বিষয় খুঁজে বের করবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চলমান স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো বিষয় নিয়ে প্রার্থনাসভার আয়োজন করবে, সেটি খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাছাই করা প্রার্থনামূলক মন্ত্র, শ্লোক, কবিতা, গান নির্বাচনে নির্দেশনা দিবেন।
- অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি প্রার্থনাসভার আয়োজন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা: ৪

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা-চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৯ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

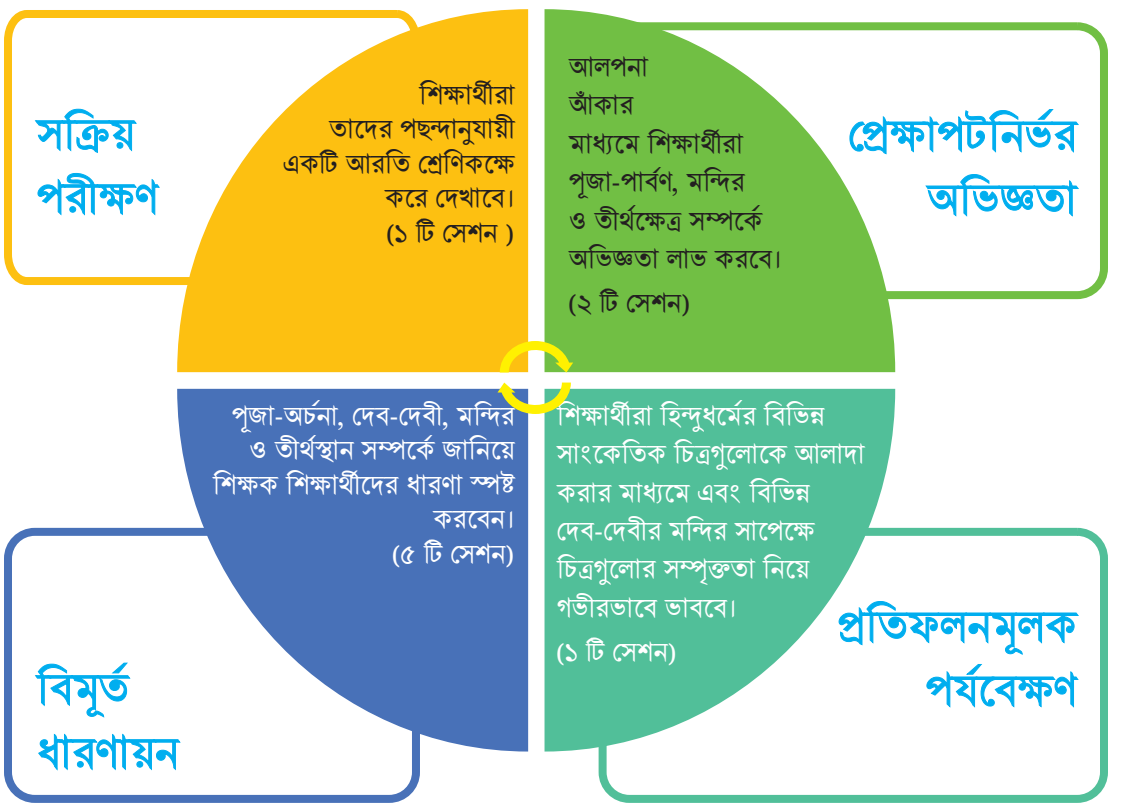

সেশন ১-২ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে শিক্ষার্থীদের তাদের বইটি খুলতে বলবেন। বলবেন, "দেখেছ, বইটাতে কী সুন্দর আলপনা আঁকা আছে! এটা দেখে তোমরা নিজেরা কিছু আলপনা আঁকো।"
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকে আলপনা যত্ন করে আঁকছে কি-না।
- এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যদি কোনো প্রশ্ন করে শিক্ষক তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
- আলপনা আঁকা শেষ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন যে তারা বাড়ি গিয়ে অভিভাবকের সাথে কথা বলে বা নকশার বই/ পত্রপত্রিকা/ ঘরে থাকা বিভিন্ন নকশাকাটা জিনিস ইত্যাদি দেখে/ নিজের মনের মতো করে বড় কাগজে/ কাপড়ে (/অন্য কোনো উপকরণে) আলপনা এঁকে নিয়ে আসে যা সে পরবর্তী সেশনে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।
- মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের আলপনাগুলো সবার দেখার জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।
- শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীদের কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখে।
- শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন।

সেশন ৩ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আলপনাগুলো নিয়ে দলে বা জোড়ায় কাজ করতে বলবেন।
- এবার নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলবেন।
    - তোমরা কি জানো বিভিন্ন পূজা-পার্বণে যে আলপনা আঁকা হয়?
    - তোমরা কখনও কি মন্দিরে আলপনা আঁকতে দেখেছো?
    - আমাদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে আলপনা কেন আঁকা হয়?
    - সকল মন্দিরে বা সকল পূজায় কি একই ধরণের আলপনা দেখতে পাও?
- শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের নিজের আঁকা আলপনার সাথে কোনো পূজা-পার্বণ বা মন্দিরের আলপনার সাথে মিল আছে কি-না তা নিয়ে অনুসন্ধান করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়ে ভাবিয়ে শিক্ষার্থীদের ভিতর থেকেই অনুসন্ধানের ফলাফল বের করে আনবেন।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের ভাবতে বলবেন, "কেন ভিন্ন ভিন্ন পূজা-পার্বণে, ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে বা

তীর্থক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা আছে?”

- এ বিষয়ে শিক্ষক তাদের একক কাজ দেবেন।

সেশন ৪ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষক এবার বিভিন্ন ধরনের আলপনা বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও তীর্থক্ষেত্রকে আলাদা করতে পেরেছে, তার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া পূজা-পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র নিয়ে প্রশ্নোত্তর, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

পূজা-পার্বণ

লক্ষ্মীদেবীর পরিচয়

লক্ষ্মী দেবী ধনসম্পদ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। তাঁর অপর নাম শ্রী। তিনি স্বত্বগুণময়ী। দেবী লক্ষ্মী ভগবান বিষ্ণুর সহধর্মিণী। তিনি স্নিগ্ধ ও সুন্দরের প্রতিক। আমাদের পরিবার আমাদের পরিবার ও সমাজের উন্নতি নির্ভর করে সম্পদের ওপর। এই সম্পদগুলোর মধ্যে ভূমি, শস্য, জ্ঞান, ধৈরর্য্য, সততা, শুদ্ধতা ইত্যাদি অন্যতম। এসকল সম্পদ অর্জনের জন্য লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা হয়।

লক্ষ্মীদেবী পদ্মফুলের ওপর উপবিষ্ট। তাঁর গায়ের রং সাদা, ধুসর, উজ্জ্বল হলুদ ও নীলাভ। তাঁর দুটি হাত। এক হাতে তিনি ধরে থাকেন পদ্ম আর এক হাতে অমৃতের কলস। তাঁর বাহন পেঁচা। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এ পূজা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা নামে পরিচিত। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলার ঘরে ঘরে পাঁচালী পড়েও লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

পূজা পদ্ধতি

যে কোনো পূজা করতে পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। পূজার ক্ষেত্রে শুদ্ধ আসনে বসে আচমন থেকে শুরু করে পঞ্চদেবতার পূজা করতে হয়। এ পূজায় বিভিন্ন ধরনের আল্পনা বা চিত্র আঁকা হয়।

বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা হয়। লক্ষ্মীপূজা পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শ উপচারে করা হয়ে থাকে। পূজায় ধানের ছড়া, পঞ্চশস্য, সোনা, রূপা, কাঁচা হলুদ, মধু, দধি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়। নলটুলী ফুল ও পদ্মফুল লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় ফুল। এ পূজার মৌলিক নীতি হিসাবে দেবী লক্ষ্মীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রণামমন্ত্র পাঠ প্রভৃতি করতে হয়। অবশেষে লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালি পাঠ করে এঁয়োগণ একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন।

লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র

ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।

যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ ।

শব্দার্থ: ওঁ নমস্তে- নমস্কার বা প্রণাম ; সর্বভূতানাং-সকল প্রাণীর ; বরদাসি- আশীর্বাদ বা মঙ্গল ; হরিপ্রিয়ে

- হে হরিপ্রিয়া; যা- যে, গতিঃ -গতি, তৎ- তার; প্রপন্নানাং - আশ্রিত বা শরণাগত; সা -তার; মে- আমার; ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ (ভূয়াৎ তু অদর্চনাৎ)- প্রচুর বা অধিক অর্চনা ।

সরলার্থ: হে হরিপ্রিয়া, তুমি সকল প্রাণীর মঙ্গল করে থাক। তোমার আশ্রিতদের যে গতি হয়, তোমার অধিক অর্চনার দ্বারা আমারও যেন সেই গতি হয়। তোমাকে নমস্কার।

লক্ষ্মীদেবীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।

শব্দার্থ: বিশ্বরূপস্য - বিশ্বরূপ; ভার্যাসি - বিষ্ণুর স্ত্রী; পদ্মে- পদ্মা; পদ্মালয়ে - পদ্মার আলয়; শুভে- শুভফল; সর্বতঃ- সকলকে; পাহি- রক্ষা করো; মাং- আমাকে; মহালক্ষ্মী- মহালক্ষ্মী; নমোস্তুতে- প্রণাম করি।

সরলার্থ: হে দেবী মহালক্ষ্মী, বিশ্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর সহধর্মিণী, তুমি পদ্মা ও পদ্মার আলয়। তুমি সকলকে শুভফল দাও। আমাকেও সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করো। তোমাকে প্রণাম করি।

লক্ষ্মীপূজার গুরুত্ব: লক্ষ্মীপূজা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় প্রতি হিন্দু বাঙালি গৃহেই সাড়ম্বরে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়। প্রতি সনাতনী হিন্দুর গৃহে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি ছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার এবং বিশেষ বিশেষ পূর্ণিমা তিথিতে দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। দেবী লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। তিনি পূজারিকে ধন- সম্পদ দান করে থাকেন। লক্ষ্মী দেবীর পূজা করলে সংসারের শ্রী বৃদ্ধি হয়। পূজারির মন শান্ত হয়।সেই সাথে সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়। লক্ষ্মীপূজায় বিভিন্ন নক্সার চিত্র এবং আল্পনা আঁকা হয়।এই আল্পনার মধ্যে তাঁরা ধানের ছড়া, লক্ষ্মী দেবীর পায়ের ছাপ, বিভিন্ন মুদ্রার ছাপ, পেঁচার পায়ের ছাপ ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলে। এর মাধ্যমে সাধারণ গৃহ বধূদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।এই পূজার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ একে অপরের অনেক কাছে চলে আসে। তাদের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। এতে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের গভীরতা আরো বৃদ্ধি পায়।

নারায়ণের পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি

ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম নারায়ণ। তাকে বাসুদেবতাও বলা হয়।তিনি পাপ মোচন ও বিঘ্ন নাশকারী দেবতা। 'নার' বা 'নারা' শব্দের অর্থ মানুষ এবং 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং নারায়ণ শব্দের অর্থ সকল মানুষ বা সকল জীবের আশ্রয়স্থল। তিনি পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম ও পরমেশ্বর নামেও পরিচিত। নারায়ণ দেবের গায়ের রং উজ্জ্বল নীল। তাঁর চারটি হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পায়। দুষ্টের বিনাশের জন্য তিনি যেমন গদা ও চক্র ধারণ করেন। ঠিক তেমনি সৎ ও সাধুদের রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর হৃদয় হয়ে ওঠে পদ্মের মত কোমল। তিনি এ জগতের সকল প্রাণির পালন করে থাকেন, এ কারণে তাঁকে সকল প্রাণির পালনকর্তা বলা হয়। তাঁর বাহন গরুড় পাখি ।

পূজাপদ্ধতি: প্রতিমারূপে, শালগ্রাম শিলারূপে, তাম্রপাত্রে বা জলে নারায়ণ পূজা করা হয়।পঞ্চসশ্য, পঞ্চধাতু এবং বিভিন্ন উপাচারে নারায়ণ পূজা করা হয়।সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গৃহ প্রবেশ বা যে কোনো শুভ

সূচনাতে নারায়ণ পূজা করে থাকে।বিশেষ ভাবে নির্ধারিত মন্ত্রে নারায়ণ পূজা করা হয়। পূজা শেষে ব্রত কথা শ্রবণ করে আরতি করা হয়। সাদা ও হলুদ ফুল এবং তুলসি পত্র নারায়ণের খুব প্রিয়।যে কোনো মাসের সংক্রান্তিতে, শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে অথবা বৈশাখ মাসে নারায়ণ পূজার প্রচলন বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নারায়ণ দেবের পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্র ধরায় চ।

পদ্মনাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।।

শব্দার্থ: ওঁ নমস্তে- নমস্কার; বিশ্বরূপায়- বিশ্বরূপকে; শঙ্খচক্র -শঙ্খচক্র; ধরায় - পৃথিবীকে; চ-এবং; পদ্মনাভায় - পদ্ম নাভিতে যাঁর; দেবায় - দেবকে; হৃষীকপতয়ে -ইন্দ্রিয়াধিপতি; নমঃ - নমস্কার।

সরলার্থ: বিশ্বরূপকে অর্থাৎ বিষ্ণুদেবতাকে প্রণাম। শঙ্খচক্র, পৃথিবীধারণকারী, পদ্মাকার নাভি সংযুক্ত, ইন্দ্রিয়াধিপতি নারায়ণদেবকে প্রণাম।

নারায়ণ দেবের প্রণামমন্ত্র

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।

শব্দার্থ- নমো- প্রণাম বা নমস্কার; ব্রহ্মণ্যদেবায়- ব্রহ্মণ্যদেবকে; গোব্রাহ্মণ - গো এবং ব্রাহ্মণ; হিতায়- মঙ্গলকারী; চ-এবং; জগদ্ধিতায়- জগতের; কৃষ্ণায়- কৃষ্ণকে; গোবিন্দায়- গোবিন্দকে; নমো নমঃ- নমস্কার, নমস্কার ।

সরলার্থ: নারায়ণ ব্রহ্মণ্যদেব। তিনিই কৃষ্ণ, গোবিন্দ। তিনি সমগ্র জগতের হিতসাধন করেন। জগতের মঙ্গলকারী গোবিন্দকে বার বার প্রণাম করি।

নারায়ণ পূজার গুরুত্ব: নারায়ণদেব এ জগতের সকল প্রাণির পালনকর্তা। নারায়ণ দেবের কাছ থেকে আমরা সন্তানাদি সহ পৃথিবীর সকল প্রাণিকে দায়িত্বের সাথে পালন করার শিক্ষা পাই।

তিনি সকল প্রাণির মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষসহ সকল প্রাণিকূলকে সেবা করে থাকি। নারায়ণদেবের পূজা করলে পূজারির মধ্যে নম্রতাবোধ জাগ্রত হয়। নারায়ণদেবের আশীর্বাদে ভক্তের গৃহে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। পাপ মোচন হয় এবং সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই ভক্তরা গৃহের সকল বাধা দূর করার জন্য ভক্তি ভরে নারায়ণ পূজা করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

পার্বণ

মঙ্গলকর আচার-আচরণই হলো পার্বণ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এই পার্বণ সমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একে ধর্মাচারও বলা যেতে পারে। আবহমানকাল থেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পার্বণ পালিত হয়। আমাদের পালিত পার্বণগুলোর মধ্যে নববর্ষ, বিভিন্ন সংক্রান্তি উৎসব, দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব, বর্ষা উৎসব, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা নববর্ষ ও পৌষ সংক্রান্তিসম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা চৈত্র সংক্রান্তি ও দোলযাত্রা সম্পর্কে জানব।

চৈত্রসংক্রান্তি

বাংলা মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি। সেই ধারাবাহিকতায় চৈত্র মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় চৈত্র-সংক্রান্তি। এ দিনটি বাংলা বছরের শেষ দিনও বটে। এ দিনকে ঘিরে থাকে নানা অনুষ্ঠান- উৎসবের আয়োজন। চৈত্র সংক্রান্তি অনুসরণ করেই আসে পহেলা বৈশাখ – নববর্ষ। শাস্ত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচার অনুসারে চৈত্র সংক্রান্তির এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, নানাবিধ পূজা-পার্বণ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পুণ্যজনক মনে করা হয়। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য আর লোকায়ত উৎসবের আমেজ পাওয়া যায় এই দিনটিকে ঘিরে।

চৈত্রসংক্রান্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে অঞ্চলভেদে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নীলপূজা: চৈত্রসংক্রান্তি উদযাপনে শিব বা নীল পূজার আয়োজন করা হয়। এ দিন ভক্তরা নীলকে সুসজ্জিত করে গীতিবাদ্য সহযোগে বাড়ি বাড়ি ঘোরান এবং ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। নীলের গানকে বলা হয় অষ্টক গান। সন্ধ্যা-বেলায় সকলের কল্যাণার্থে ভক্তরা প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবপূজা করে সারাদিনের উপবাস ভঙ্গ করেন। নীল পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীল নাচ এবং শিবের গাজন। উত্তরবঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে একে গম্ভীরা পূজা বলে।

চড়ক পূজা: লোকউৎসব হিসেবে চড়ক পূজা বেশ পরিচিত। চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে যে আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে তা অনেক এলাকায় গাজন, গম্ভীরাপূজা বা নীলপূজা নামে পরিচিত। চৈত্রের দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টির জন্য চাষীরা পালার আয়োজন করে থাকে যা গাজন নামে পরিচিত। যারা চড়ক পূজা উপভোগ করতে আসে তারা কোনো ধর্মের বাঁধনে আবদ্ধ নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা সময়জুড়েই মেলা চলতে থাকে মহাস-মারোহে। চড়ক পূজা যদিও নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান কিন্তু একে কেন্দ্র করে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

চৈত্রসংক্রান্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে অঞ্চলভেদে আরও নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গ্রাম-বাংলায় খাওয়া হয় ছাতু, দই ও পাকা বেল সহযোগে এক বিশেষ শরবত। এদিনে নারীরা একটি নির্দিষ্ট খেজুরগাছের গোড়ায় দুধ এবং ডাবের জল ঢেলে পূজা করেন। পূজা শেষে একজন খেজুর গাছ থেকে খেজুর ভেঙে ভক্তদের মাঝে বিলাতে থাকেন। সেই খেজুর খেয়ে উপোস ভঙ্গ করেন ভক্তরা। একে খেজুর ভাঙ্গা উৎসব বলে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈসাবি উৎসব: চৈত্র সংক্রান্তি বাঙালি ছাড়াও উদযাপন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও। তাঁদের ভাষায় বৈসাবি পালিত হয় চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষের দিনে। বৈসাবি'র 'বৈ' এসেছে ত্রিপুরাদের 'বৈসু' থেকে, 'সা' এসেছে মারমাদের 'সাংগ্রাই' থেকে এবং 'বি' শব্দটি চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের 'বিজু' থেকে। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সকলের মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দোলযাত্রা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলেছিলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস সেখান থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি হয়। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সকালে রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ আবির রঙে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। একে দোলপূজাও বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দোলায়

চড়িয়ে কীর্তনগান সহকারে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এজন্য উৎসবটিকে দোলযাত্রা বলা হয়। এসময় ভক্তরা আবির খেলে পরস্পরকে রাঙিয়ে দেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার এই দিনে রাধা-কৃষ্ণকে দোলা দুলিয়ে রঙ খেলা হয় বলেই এদিনকে দোলপূর্ণিমা বলা হয়। এ পূজার পূর্বরাত শুক্লা চতুর্দশীতে খড়-কুটা জ্বালিয়ে অগ্নি উৎসব করা হয়। একে মেড়া পোড়ানো কিংবা বুড়ির ঘর পোড়ানো বলা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, বুড়ির ঘর আগুনে পুড়িয়ে অমঙ্গলকে তাড়ানো হয়।

দোলযাত্রা উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সার্বজনীন দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে আবির ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মেতে ওঠেন। একে বসন্ত উৎসবও বলা হয়। কোথাও কোথাও এটি হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

দোলযাত্রার গুরুত্ব

দোল উৎসবের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক। উৎসবমুখর এদিনে সবাই অতীতের সমস্ত দোষত্রুটি ঝগড়া-বিবাদ ভুলে গিয়ে রং খেলায় মেতে ওঠে। পরমতসহিষ্ণুতার বৃদ্ধি ঘটে। এক অপরকে ক্ষমা করে। সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উৎসবস্থলে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মেলা বসে। গৃহস্থলীর অনেক সামগ্রী মেলায় পাওয়া যায়। সাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়।

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দিরে দেবতার পুজো করা হয়। এজন্য মন্দিরকে বলা হয় দেবালয়। দেবদেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়ে থাকে। যেমন – কালী মন্দির, দুর্গা মান্দির, শিব মন্দির, আদিনাথ মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির, কান্তজী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি। আবার স্থানের নাম অনুসারেও মন্দিরের নাম হয়ে থাকে। যেমন- ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনা মন্দির ইত্যাদি। অনেক জায়গায় এসব মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক সাধুসঙ্গ। তাঁদের আবাসস্থল। বিভিন্ন আশ্রম। সাধুদের লীলাক্ষেত্র বা বিচরণক্ষেত্রগুলো সবই পুণ্যক্ষেত্র। যাকে বলা হয় তীর্থক্ষেত্র। সকল মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন ভালো হয়। পবিত্রতা বেড়ে যায়। মনে আসে প্রশান্তি। এগুলো আমাদের ঐতিহ্যও বটে। আমরা এখন দুটি মন্দির ও দুটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে জানব।

কান্তজী মন্দির

কান্তজী মন্দির বা কান্তজিউ মন্দির বাংলাদেশের দিনাজপুরে ঢেঁপা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির। এটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কান্ত বা কৃষ্ণের মন্দির হিসেবে পরিচিতি। এটি ইটের তৈরি অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির। বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নির্দশন রয়েছে এ মন্দিরে। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন স্থানীয় রাজা প্রাণনাথ রায় মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পালিত সন্তান রাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। দীর্ঘ ৪৮ বছর শতাধিক শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই কান্তজীর মন্দির। মন্দিরের বাইরে পুরো দেয়াল জুড়ে টেরাকোটার টালিতে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত সহ বিভিন্ন পৌরাণিক কহিনির চিত্রায়ণ। এ কারণেই এ কান্তমন্দিরটি বাংলার স্থাপত্যশিল্প বৈশিষ্ট্যে অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনি সমূহকে এখানে জনসাধারণের জীবনের মতো চিত্রায়িত করা হয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পৌরাণিক ঘটনা। পৌরাণিক কাহিনির লৌকিক উপস্থাপনে তাই কারিগরদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন এই কান্তজীর মন্দির।

কান্তজীর মন্দিরের দেওয়ালের ওপর পোড়ামাটির এ বিশাল অলঙ্করণ সে সময়ের জীব ও প্রাণশক্তিরই প্রকাশ এবং হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের পলিময় মাটিতে লালিত শক্তির ভেতর থেকেই এ শিল্প বেড়ে উঠেছিল।

এখানে রাধা-কৃষ্ণের পূজার পাশাপাশি প্রতি বছর মহাসমারোহে কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমায় রাস উৎসব হয়। ভগবানের আরাধনা ও পুণ্য লাভ করতে ভক্তরা এখানে আসেন। বহু বছর ধরে হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য হিসেবে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হচ্ছে এই রাসমেলা।

আদিনাথ মন্দির

বাংলাদেশের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর মধ্যে আদিনাথ মন্দির অন্যতম। এটি কক্সবাজার জেলান্তর্গত দ্বীপ মহে-শখালিতে অবস্থিত। দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে এটি শিব মন্দির নামেও পরিচিত। এ মন্দিরটি মৈনাক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। আদিনাথের অপর নাম মহেশ। মহেশের নামানুকরণে এ জনপদের নামকরণ করা হয় মহেশখালি। অধিকাংশ প্রাচীন মন্দির এবং তীর্থস্থান নিয়ে আছে অনেক পুরাণকথা, লোককথা। যেখানে ইতহাস পাওয়া যায় না সেখানে লোককথার ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানেও লোককথা থেকে জানা যায়, ত্রেতাযুগে লঙ্কার রাজা রাবণ মৈনাক পাহাড়ের ওপর শিবকে স্থাপন করেন। পরবর্তীতে কালক্রমে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আদিনাথের মন্দির। মৈনাক চূড়ায় এই আদিনাথ মন্দিরের সাথে রয়েছে অষ্টভুজা দেবী দুর্গার মন্দির, ভৈরব মন্দির ও রাধাগোবিন্দ মন্দির। এটি হিন্দুদের একটি অন্যতম তীর্থস্থানও বটে। এখানে প্রতিবছর শিব চতুর্দশী তিথিতে মহাধুমধামে বিশেষভাবে পূজা-অর্চনা হয়। এ সময় স্থানটি দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়। সপ্তাহকালব্যাপী মেলা হয়। মূল মন্দিরের পেছনে দুটি পুকুর রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৮০ ফুট উচ্চতায় হলেও পুকুর দুটি সব সময় জলে পরিপূর্ণ থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস, এখানে স্নান করলে রোগ-শোক-পাপ-তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

তীর্থক্ষেত্র

ওড়াকান্দি

বাংলাদেশে অবস্থিত পুণ্যভূমি বা তীর্থক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ওড়াকান্দি অন্যতম। এটি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানায় অবস্থিত। হরিচাঁদ ঠাকুরের সাধনভূমি, কর্মভূমি লীলানিকেতন এই ওড়াকান্দি। হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলা ১২১৮ সনে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ওড়াকান্দির পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাফলীডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন।

ছোটবেলা থেকে হরিচাঁদের মধ্যে অনেক অলৌকিকতা দেখা দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী অনেককে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন। বহু মানুষের সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর কাছে মানুষ আসতে থাকে শান্তির জন্য। ধীরে ধীরে তিনি সাধারণ মানুষের ঠাকুর হয়ে ওঠেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর অনুসারী হয়।

হরিঠাকুরের অনুসারীগণ সারাক্ষণ হরিনামে মেতে থাকেন। তাই তারা মতুয়া নামে পরিচিত। মতুয়ামতে কোনো জাতভেদ নেই। ধর্মানুশীলন পদ্ধতিও অতি সহজ। সংসার কজে ব্যস্ত থেকে খুব সহজেই ধর্মানুশীলন করা যায়। হরিঠাকুর বলেছেন ‘হাতে কাম মুখে নাম’। যার যে কাজ সেটা করতে হবে আর মুখে হরিনাম বলতে হবে।

ধীরে ধীরে ওড়াকান্দি তীর্থভূমি হয়ে ওঠে। কেবল হিন্দুধর্মানুসারীদের কাছেই নয়, অন্যদের কাছেও এটা তীর্থ-স্থান। পুন্য অর্জনের জন্য শান্তিপ্রাপ্তির জন্য সকলে এখানে আসে।

হরিঠাকুরের জন্মতিথিকে বলা হয় মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী। মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে ওড়াকান্দিতে বিশাল মেলা হয়। তিনদিনব্যাপী এই মেলা হয়। কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয় মেলাতে। দূর-দূরান্ত থেকে মতুয়ারা দলে দলে এই মেলাতে আসে। হরিঠাকুরের এই মেলাকে বারুনী মেলাও বলা হয়। কারণ এই তিথিতে মহাবারুনী স্নান হয়। এই পুণ্যভুমিতে কামনা পুকুর নামে একটি পুকুর আছে। ভক্তদের এবং তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস, এই পুকুরে স্নান করলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলন হয় এখানে। মতুয়ারা আসে নিশান ওড়াতে ওড়াতে, জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে। 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হয় চারিদিক। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে আসতেও পুণ্যার্থীরা ক্লান্তিবোধ করেন না।

লাঙ্গালবন্দ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অসংখ্য তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো লাঙ্গালবন্দ। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এটি অবস্থিত। সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মপুত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মার পুত্র। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এখানে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অসংখ্য পুণ্যার্থী এখানে পুণ্যস্নানের জন্য আসেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই তিথিতে এখানকার জল স্পর্শ করলে সকল পাপ মোচন হয়। লাঙ্গালবন্দের এ জলধারায় স্নান করে পরশুরাম মুনি পাপ মুক্ত হয়েছিলেন। শাস্ত্রোক্ত পরশুরাম মুনির পাপ মুক্তির কথা স্মরণ করেই বহু বছর ধরে পুণ্যার্থীরা এই অষ্টমী-পুণ্যস্নান করে আসছেন। মনে করা হয় চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জগতের সকল পবিত্র স্থানের পুণ্য ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের সময় ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন করা হয়।

আগত ভক্তবৃন্দ যাতে নির্বিঘ্নে পুণ্যস্নান করতে পারেন সেজন্য এখানে অনেক ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধানো ঘাটগুলো নামও খুব নান্দনিক। যেমন- অন্নপূর্ণা ঘাট, প্রেমতলা ঘাট, জয়কালী ঘাট, বরদেশ্বরী ঘাট, গান্ধীঘাট, শঙ্করঘাট, কালীদহ ঘাট, শিখরী ঘাট ইত্যাদি। এই ঘাটগুলোর পাশাপাশি এখানে অনেক মান্দর ও আশ্রম গড়ে উঠেছে।

সেশন ৯ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কোনো একটি আরতি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণি-উপযোগী কোনো একটি আরতি নির্বাচনে সহায়তা করবেন।
- (আগের সেশনে পরামর্শ করা এবং আরতি নির্বাচনের কাজটি করে রাখতে হবে)
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভালোলাগা সাপেক্ষে এবং শিক্ষকের সহায়তায় প্রত্যেকে যেকোনো একটি আরতি শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা: ৫

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৫ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

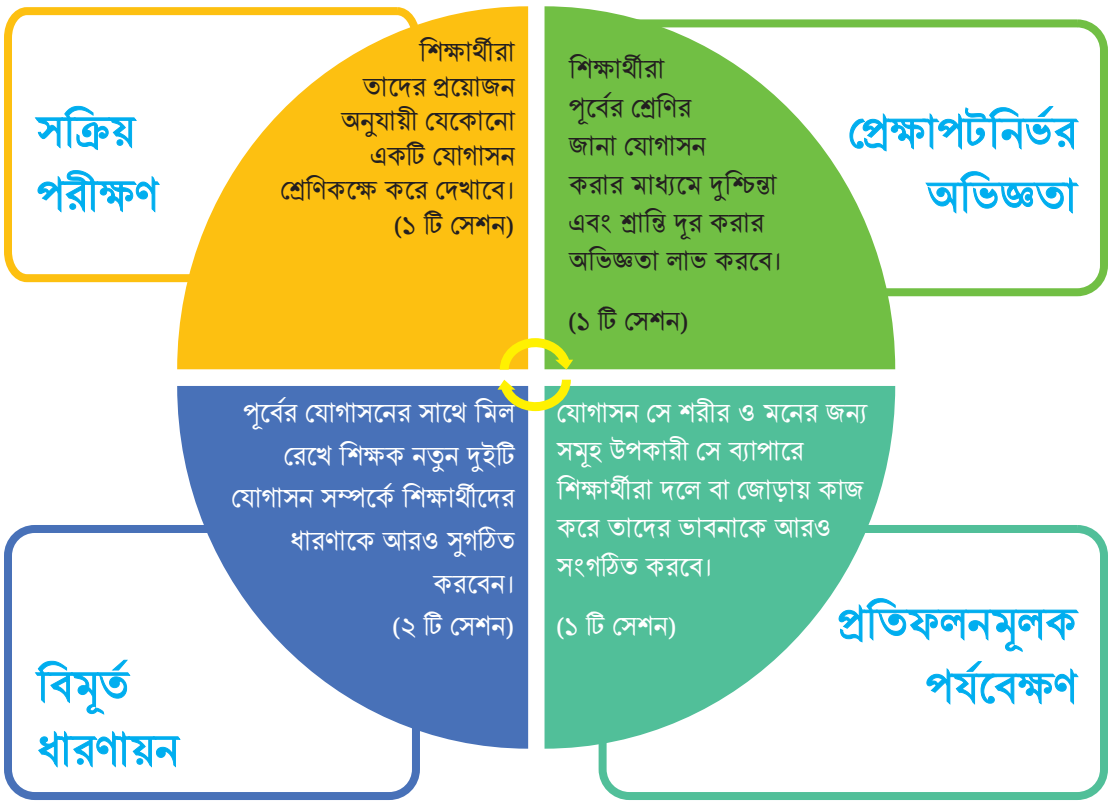

সেশন ১ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, “আমাদের মন বিভিন্ন কারণে খারাপ হতে পারে, যেমন কেউ পছন্দের কিছু হারিয়ে ফেললো বা কারো সাথে মন খারাপ হওয়ার মতো কিছু ঘটলো। আমাদের প্রিয় বন্ধুর সাথে

একদিন দেখা না হলে তো আমাদের মন খারাপ হয়, তাই না? খেলায় হেরে গেলেও মন খারাপ হয় তাই না?"

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষক কাছাকাছি সময়ে ঘটা এরকম মন খারাপের ঘটনা শুনবেন।
- অতঃপর বলবেন, "তোমাদের কি খেয়াল আছে, আমরা আগের শ্রেণিতে পড়েছিলাম যে, যোগাসন আমাদের মনকে ভালো করে দিতে পারে?"
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একটি পছন্দমতো যোগাসন নিজে করে দেখাবেন এবং বলবেন যে, "চলো আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য শান্ত মনে এই যোগাসনটা করি।"
- যোগাসন শেষে জিজ্ঞেস করবেন, "এবার একটু বলো তো, সবার কি মনে একটু শান্তি শান্তি লাগছে? একটু কি মন খারাপটা কম মনে হচ্ছে?"
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের অনুভূতি শুনবেন।

সেশন ২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া যোগাসনের উপকারিতা সম্পর্কিত তালিকাটি পূরণ করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষার্থীরা এই তালিকাটি নিয়ে জোড়ায় বা দলে আলোচনা করবে। শিক্ষক আলোচনাটি পর্যবেক্ষন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যোগাসন নিয়ে আলোচনাটি সঠিকভাবে এগোচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের যোগাসন সম্পর্কে আলোচনা সাপেক্ষে যে ধারনাটি পেলো তা নিজ নিজ খাতায় তুলতে বলবেন।

সেশন ৩-৪ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, "দেখলে তো যোগাসন শরীর ও মন ভালো রাখতে কতই না সাহায্য করে। আগের শ্রেণিতে তুমি দুইটি যোগাসন সম্বন্ধে জেনেছ, চলো এবার আরও দুইটি যোগাসন সম্বন্ধে জানি।" এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজসমূহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণাকে আরও সুগঠিত করবেন।

যোগাসন

যোগ বলতে বোঝায় মনঃসংযোগ করা। এই মনঃসংযোগ করতে হলে মানুষকে আরামপ্রদ বিশেষ কোনো ভঙ্গিমা বা আসনে বসে তাঁর আরাধনা করতে হয়। যোগ এবং আসন দুয়ে মিলে হয় যোগাসন। নিয়মিত সঠিক পদ্ধতিতে যোগাসন অনুশীলন করলে সুস্থ থাকা যায়। আমরা নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করব। বিভিন্ন

প্রকার যোগাসন আছে। যেমন- বজ্রাসন, শীর্ষাসন, হলাসন, পদ্মাসন, শবাসন, সিদ্ধাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা পদ্মাসন ও শবাসন সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা হলাসন ও সিদ্ধাসন সম্পর্কে জানব আর অনুশীলন করতে চেষ্টা করব।

যোগের আটটি অঙ্গ । যথা-

১। যম - যম মানে সংযমী হওয়া।

২। নিয়ম - শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। নিয়মিত ও পরিমিত স্নান, আহার ও বিশ্রাম করা।

৩। আসন – বিশেষ ভঙ্গিতে বসাকে আসন বলে।

৪। প্রাণায়াম - শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে প্রাণায়াম বলে।

৫। প্রত্যাহার - মনকে বহির্মুখ হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে।

৬। ধারণা - কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

৭। ধ্যান - কোনো এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

৮। সমাধি - ধ্যানস্থ অবস্থায় মন যখন ইষ্টচিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকে তখন সে অবস্থানকে বলা হয় সমাধি।

আসন যোগের একটি অঙ্গ। স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নামই আসন। সুতরাং যোগ অভ্যাস করার জন্য যে ভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না তাকে যোগাসন বলে।

সিদ্ধাসন:

সিদ্ধাসনরত এই আসনে কোনো ব্যক্তিকে দেখতে অনেকটা ধ্যানস্থ কোনো সাধু বা যোগীর মতো মনে হয়। সিদ্ধপুরুষগণ এই আসন অনুশীলন করেন বলে এই আসনের নাম সিদ্ধাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি: সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া বা মেরুদন্ড সোজা কর বসতে হবে। এবার ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙ্গে পায়ের গোড়ালি উরুর সংযোগ স্থল তলপেটের নিচে স্পর্শ করে রাখতে হবে। তারপর বাঁ পা হাঁটু ভেঙ্গে ডান পায়ের ওপর রাখতে হবে। দু পায়ের গোড়ালি তলপেটের নিচে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। হাতের তালু ওপর দিকে করে ডানহাতের কবজি ডান হাঁটুর ওপর আর বাঁ হাতের কবজি বাঁ হাটুর ওপর রাখতে হবে। দু হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছোঁয়াতে হবে। অন্য আঙুলগুলো সোজা থাকবে। তারপর পিঠ, ঘাড় আর মাথা সোজা রেখে চোখ বন্ধ করে দুভ্রুর মাঝে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আসনটি ৫ মিনিট করতে হবে। শেষে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

গুরুত্ব ও প্রভাব:

সিদ্ধাসনে শরীরের যথেষ্ট বিশ্রাম হয়। এই আসনে বসে থাকার ফলে শরীর যেমন বিশ্রাম পায় তেমনি দু পা

আড়াআড়ি আর পিঠ সোজা থাকার ফলে মন স্থির ও তৎপর থাকে। হাঁটু আর গোড়ালির গাঁট শক্ত হয়ে গেলে এই আসনে উপকার পাওয়া যায়। এই আসনে কটিদেশে আর উদরাঞ্চলে ভালো রক্তসঞ্চালন হয় এবং এর ফলে মেরুদন্ডের নিম্নভাগ আর পেটের ভিতরকার যন্ত্রগুলি সতেজ ও সবল হয়। কোমর ও হাঁটুর সন্ধিস্থল সবল হয়। এই আসন অভ্যাসে উদরাময়, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস, হাঁপানী প্রভৃতি রোগ দূর হয়। অর্শ রোগে এই আসন অত্যন্ত ফলপ্রদ। সিদ্ধাসনে বসে জপ, প্রাণায়াম ও ধ্যানধারণাদি অভ্যাস করলে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শলভাসন

'শলভ' শব্দের অর্থ পতঙ্গ। এই আসন অনুশীলনের সময় শরীরকে পতঙ্গের মতো দেখায় বলে আসনটির নাম শলভাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি: আরামদায়ক শক্ত কোনো সমতল জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। চিবুক মাটির ওপর থাকবে। হাত দুটি সোজা ভাবে শরীরের দুপাশে উরুর নিচে এবং হাতের তালু দুটো মাটিতে সমান করে পাতা থাকবে। হাঁটু, উরু ও পায়ের গোড়ালি জোড়া রাখতে হবে। এরপর শ্বাস ধীরে ধীরে গ্রহণের সাথে হাঁটু ভাঁজ না করে উরু ও পা দুটি সোজা রেখে মেঝে থেকে উপরে তুলতে হবে। এই আবস্থায় ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।৫/১০ সেকেন্ড পর শরীর শিথিল করতে করতে পা দুটি নামিয়ে শবাসন করে বিশ্রাম নিতে হবে। আসনটি ৪/৫ বার অনুশীলন করতে হবে।

শলভাসনের উপকারিতা:

মেরুদন্ড ও কোমরের যে কোনো ব্যথায় এই আসন উপকারী। আসনটি মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও সবল করে, তলপেট ও পিঠের নিচের অংশের মেদ কমায়। এতে উরু ও কোমরের পেশীর গঠন সুন্দর হয়। আসনটি বাত বা সায়টিকার এক আশ্চর্য প্রতিষেধক। এই আসনে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা দূর হয়, পেটে বায়ুর প্রকোপ কমে, পেট ফাঁপা সারে, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফুসফুস সংলগ্ন স্নায়ুগুলি এবং বায়ুধারণকারী কোষগুলি সুপুষ্ট ও সবল হয়।

সেশন ৫ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন যে তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো এক বা একাধিক যোগাসন শ্রেণিকক্ষে করে দেখাবে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে যোগাসন করে দেখাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা: ৬

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ১২টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

সেশন ১ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে শিক্ষার্থীদের বলবেন, "আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা, পরোপকার, প্রভৃতি মানবিক গুণ নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা আছে। আমাদের যার যার জীবনে ঘটে যাওয়া এরকম কোনো ঘটনা নিয়ে চলো একটি গল্প লিখি।"

- শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট জায়গায় গল্পটি লিখছে কি-না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

- নির্ধারিত জায়গায় যদি গল্পটির সঙ্কুলান না হয়, তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বাড়তি কাগজ সরবরাহ করবেন।

- শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যাতে নিজ জীবনের গল্প লেখার সময় সহপাঠী দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

সেশন ২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বলবেন, "তোমরা যে নিযের জীবনের গল্পগুলো লিখলে, এটা এবার সবার সামনে গিয়ে উপস্থাপন করবে।" (আগের সেশনে কিছুটা সময় হাতে থাকলে গল্পের উপস্থাপন শুরু করতে পারে।)

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপস্থাপনের সময় খেয়াল করবেন যে তার অন্য সহপাঠীরা উপস্থাপনটি মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এই গল্পগুলো শোনার পরে প্রশ্নংসা করে উৎসাহ প্রদান করবেন।

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের দলে বা জোড়ায় ভাগ করে দেবেন। এবার এই গল্পগুলো থেকে পাওয়া ভালো কাজগুলোর একটি তালিকা করতে বলবেন, যাতে তারা বুঝতে পারে ভালো কাজগুলো আমাদের প্রত্যে-কের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

সেশন ৩-৫ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, "তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, তোমাদের লেখা গল্পগুলোতে নৈতিকতা কী সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে! চলো, নৈতিকতা নিয়ে হিন্দুধর্মের আলোকে কী বলা আছে জেনে নিই।" প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজগুলোর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণাকে আরও গভীরে নিয়ে যাবেন।

নৈতিক মূল্যবোধ

নৈতিকতা

আমাদের চারপাশে ভালো-মন্দ দুটি দিকই আছে। যে কাজ করলে মঙ্গল হয় সেটি ভালো কাজ। আর যে কাজ করলে অমঙ্গল হয় সেটি হচ্ছে মন্দ কাজ। কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার জ্ঞানকে বলে নীতি। নীতির সঙ্গে যা যুক্ত হয় তাই নৈতিকতা। নৈতিকতা বলতে বুঝায় ভালোকাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝতে পারা। নৈতিকতা একটি চারিত্রিক গুণ, একটি মূল্যবোধ। সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম এ সবই নৈতিকতা। নৈতিকতা ধর্মের অঙ্গ। এখন আমরা সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও সম্প্রীতি সম্পর্কে জানব ।

সত্যবাদিতা

উপাখ্যান : সত্যবাদী সত্যকাম

প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর আশ্রমে শিষ্যদের নিয়ে ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একটি বালক মাথা নিচু করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?"

বালকটি হাত জোড় করে প্রণাম করে উত্তর দিল, "আমার নাম সত্যকাম। আমার বাড়ি পাশের গ্রামে। সেখান থেকেই আপনার কৃপালাভ করার জন্য এসেছি।"

ঋষি গৌতম বললেন, "এখানে কী চাও?' বালকটি বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে ধর্মবিষয়ে শিক্ষালাভ করতে চাই।'

তখন ঋষি তার পিতৃপরিচয় জানতে চাইলেন। বালকটি করজোড়ে বলল, 'গুরুদেব, আমি আমার পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানিনা তবে বাড়িতে আমার মা আছেন। মার কাছ থেকে জেনে আগামীকাল আপনাকে বলব। ঘরে এসে সত্যকাম মাকে সব কথা খুলে বলল। তার মা তাকে তার পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু না বলে শুধু বললেন, "আমার নাম জবালা। তাই তুমি জাবাল সত্যকাম।"

পরের দিন সত্যকাম ঋষির আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবকে বিনয়ের সাথে বলল,"গুরুদেব, আমার মা আমার পিতা সম্পর্কে কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন - আমি জবালা। তাই তুমি জাবাল সত্যকাম।"

এমন নির্ভীক সত্যকথা শুনে ঋষি সত্যকামকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন,"বৎস, সত্যকাম, তুমি সত্যকথা বলেছ। এমন সত্যকথা সকলে বলতে পারে না। একমাত্র সত্যবাদী এবং সৎসাহসীরাই এমন সত্য কথা বলতে পারে। তোমর এই সত্যবাদিতায় আমি খুশি হলাম। আমি তোমাকে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করব।" সেদিন থেকে সত্যকাম ঋষি গৌতমের আশ্রমে থেকে বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করল।

উপাখ্যানের শিক্ষা:

সত্য সর্বদা প্রকাশিত । সত্য প্রকাশ করা উচিত । সত্য কখনও গোপন করা যায় না ।

ভ্রাতৃপ্রেম

স্বার্থহীন ভালোবাসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সহোদরের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্রতম সম্পর্ক হলো ভায়ের প্রতি ভায়ের ভালোবাসা। এই ভালোবাসারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে রামায়নে রাম ও লক্ষ্মণের ভাতৃপ্রেম। বাল্মীকি মুনি রচিত রামায়ন নামক আদিকাব্যের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। অযোধ্যার রাজা দশরথের ছিল তিন রানি। বড় রানি কৌশল্যার পুত্র শ্রী রাম চন্দ্র। মেঝো রানি কৈকেয়ীর পুত্র ভরত।এবং ছোট রানি সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রঘ্ন। ছোট বেলা থেকেই রাম ও ল^{3}নে মধ্যে ছিল খুব ভাব । রাম ল^{3}ন দুটি ভাই যেন হরি-হর আত্মা। এদের একে অপরের জন্য ছিল অসীম ¯স্নেহ ও ভালোবাসা।

পিতৃ সত্য রক্ষার জন্য রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। তখন তাঁর বনবাসের সঙ্গী হয় স্ত্রী সীতা। ভাই ল^{3}ন তখন তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে ছেড়ে দাদার সাথে বনবাসে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। দাদা রামের শত আপত্তি সত্ত্বেও সে রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র দাদার প্রতি দাযিত্ব ও কর্তব্য বোধ থেকে এ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিঃসংকচে নিজের জীবনের চৌদ্দটি বছর পিতৃ তুল্য ভায়ের সেবার জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি সদা সর্বদা দাদা রামের ছায়া সঙ্গী ছিলেন। শ্রী রাম চন্দ্রও তাঁর ভাই ল^{3}নকে অত্যন্ত ¯ স্নেহ করতেন। তাঁদের ভাতৃ প্রেমের কিছু দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী রয়েছে। যেমন : মুনি বিশ্বামিত্র যখন রামকে তারকা রাক্ষসী বধের জন্য আমন্ত্রন জানান। তখন লক্ষ্মণ দাদার বিপদের কথা ভেবে রামের সঙ্গে থেকে তারকা রাক্ষুসীকে বধ করেন। শ্রী রাম চন্দ্র যখন কাল পুরুষের সাথে কথা বলছিলেন তখন লক্ষ্মণ দাদার নিরাপত্তার কথা ভেবে দ্বার রক্ষীর দায়িত্ব পালন করেন।

বনবাসে থাকা কালে তিনি একাধারে রামের ভাই বন্ধু ও সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। তিনি সর্বক্ষণ দাদার পাশে থেকেছেন। তাঁর সেবা করেছেন। । বিপদের এতটুকু আঁচও দাদার গায়ে লাগতে দেননি।

লন্ডন কর্তৃক মেঘনাদ বধ ছিল দাদা রামকে ভালোবাসারর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । মেঘনাদ ছিলেন লংকার রাজা রাবনের পুত্র। তিনি ছিলেন মহা পরাক্রম শালী একজন যোদ্ধা। তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করা ছিল একরকম অসম্ভব ব্যাপার। কেননা মেঘনাদের ওপর এমন বর ছিল যে, যে ব্যাক্তি চৌদ্দ বছর না খেয়ে না ঘুমিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করবেন তিনিই একমাত্র মেঘনাদকে বধ করতে পারবেন। বনবাসের সময় ল^{3}ন এই অত্যন্ত দুরহ কঠিন কাজটি করেছিলেন তাঁর প্রিয় দাদা রামের জন্য । দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর একটি রাতের জন্যও নিদ্রা যাননি ।অতন্দ্র প্রহরির মত দিবা রাত্রি সব সময় শুধু দাদার পদসেবা করেছেন।

ভায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এমন আত্মদানের চিত্র সত্যিই দুর্লভ। ভায়ের জন্য এত বড় ত্যাগের ইতিহাস পৃথিবীতে সত্যিাই বিরল। আজও মানুষ ভায়ে ভায়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রাম ল^{3}নের উদাহরণ দেয়।

বাস্তব জীবনে আমরা রামায়ণের এই দুই ভায়ের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের ভাই বোনের সাথে সহপাঠীদের সাথে প্রতিবেশীদের সাথে সব সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখব । কখনো কারো সাধে ঝগড়া করব না। হিংসা বিদ্বেষ করব না। সকলে মিলে মিশে একত্রে বসবাস করব।সকলে সকলের সুখ দুঃখ ভাগ করে নিব । তাহলেই আমাদের জীবন হয়ে উঠবে অনেক সুশৃঙ্খল , সুন্দর ও আনন্দময়।

গুরুজনে ভক্তি

অনেক দিন আগের কথা হস্তিনাপুরে বাস করতেন কর্ণ নামে একজন মহা শক্তিশালি বীর। তিনি দাতা কর্ণ

নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্য্যদেব ও কুন্তির পুত্র। তিনি জন্মেছিলেন সূর্য্যাকৃতির স্বর্ণ কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে। এই কবচ কুণ্ডলের গুণে তিনি ছিলেন অপরাজেয় ছোটবেলা থেকেই অস্ত্র ও ধর্নুবিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। মহাবীর কর্ণ অস্ত্র শিক্ষার জন্য ভগবান পরশু রামের স্মরনাপন্ন হন।

ভগবান পরশু রাম ছিলেন অস্ত্র বিদ্যার জনক। হিন্দু পুরানে অস্ত্র গুরুদের মধ্যে ভগবান পরশু রাম অন্যতম। তিনি সূর্য্যপুত্র কর্ণকে শিষ্যরূপে গ্রহন করেন। গুরুর প্রতি ছিল কর্ণের গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। তিনি গুরু গৃহে থেকেই অস্ত্র শিক্ষার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করতে থাকেন। গুরুর প্রতিটি আদেশ তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলতেন। গুরুর আদেশেই তিনি কঠোর অধ্যবসায় ও নিরলস পরিশ্রম করে ক্রমাগত অস্ত্র ও ধর্নুবিদ্যার অনুশীলন করতে থাকেন।

এভাবে দীর্ঘ দিন কেটে যায়। একদিন গুরু পরশু রাম তাঁর শিষ্যদের অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি একটি প্রস্তর খন্ডের ওপর বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্য এগিয়ে যান। এমন সময় শিষ্য কর্ণ গুরুদেবকে বলেন,গুরুদেব শক্ত প্রস্তর খন্ডের ওপর বিশ্রাম নিতে আপনার কষ্ট হবে। গুরুদেব দয়া করে আপনি আমার কোলে মাথা রেখে শান্তিতে বিশ্রাম করুন। এক কথা শুনে গুরু পরশুরাম বললেন, এতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না । কারন এভাবে বিশ্রাম নেয়া আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু শিষ্য কর্ণ গুরুকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করে তাঁকে রাজি করান। ভগবান পরশুরাম শিষ্যের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। কর্ণ তখন গুরুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন । এভাবে অনেকটা সময় কেটে যায়। হঠাৎ বনের ভীতর থেকে একটি বিষাক্ত কাকঁড়া বিছে এসে কর্ণের হাটুতে কামড় দেয়। এই বিষাক্ত কীটের কামড়ে কর্ণের পা দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর পরনে কাপড়টি রক্তে ভিজে যায়। সে প্রচন্ড কষ্ট পেতে থাকে। এতটা কষ্ট পেলেও গুরুদেবের বিশ্রমের ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে তিনি দাঁতমুখ চেপে ব্যাথা সহ্য করেন। তিনি এতটুকুও নড়াচড়া করেন না পাছে গুরুদেবের বিশ্রাম ভঙ্গহয়। গুরুজনের প্রতি কতটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকলে এতটা কষ্ট সহ্য করা যায়।

কাকঁড়া বিছের মত একটা বিষাক্ত কীটের কামড়ের যন্ত্রনা সহ্য করেও তিনি গুরুকে বুঝতে দিতে চাননি তাঁর যন্ত্রার কথা। এই যে গুরুর প্রতি কর্ণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা একেই বলে গুরুজনে ভক্তি। মহাবীর কর্ণের গুরুদেবের প্রতি এই ভক্তি ও ভালোবাসা ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমরাও কর্ণের মত হব। মা বাবা ও শিক্ষকসহ সকল গুরুজনকে শ্রদ্ধা করব। তাঁদের আদেশ মান্য করব। অর্জন করব গুরুজনে ভক্তির মত নৈতিক গুণ।

সেশন ৬ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিবেন।
- এবার জোড়ায় থাকা শিক্ষার্থীদের শিক্ষক কাজ বুঝিয়ে দিবেন। কাজটি হলো: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জোড়ার অপর শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে। এই সাহায্যটি হতে পারে পড়াশোনা বা সপ্তম শ্রেণির পাঠনির্ভর বা অন্য যেকোনো বিষয়, এমনকি খেলাধূলা। অর্থাৎ প্রতিটি জোড়ায় একজন শিক্ষার্থী অপর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সাহায্য নিবে এবং সেও অপর শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে।
- এবার শিক্ষক প্রতিটি জোড়াকে শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে এসে তারা একে অপরকে কী সাহায্য করেছে তা সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা: ৭

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা-চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৯ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

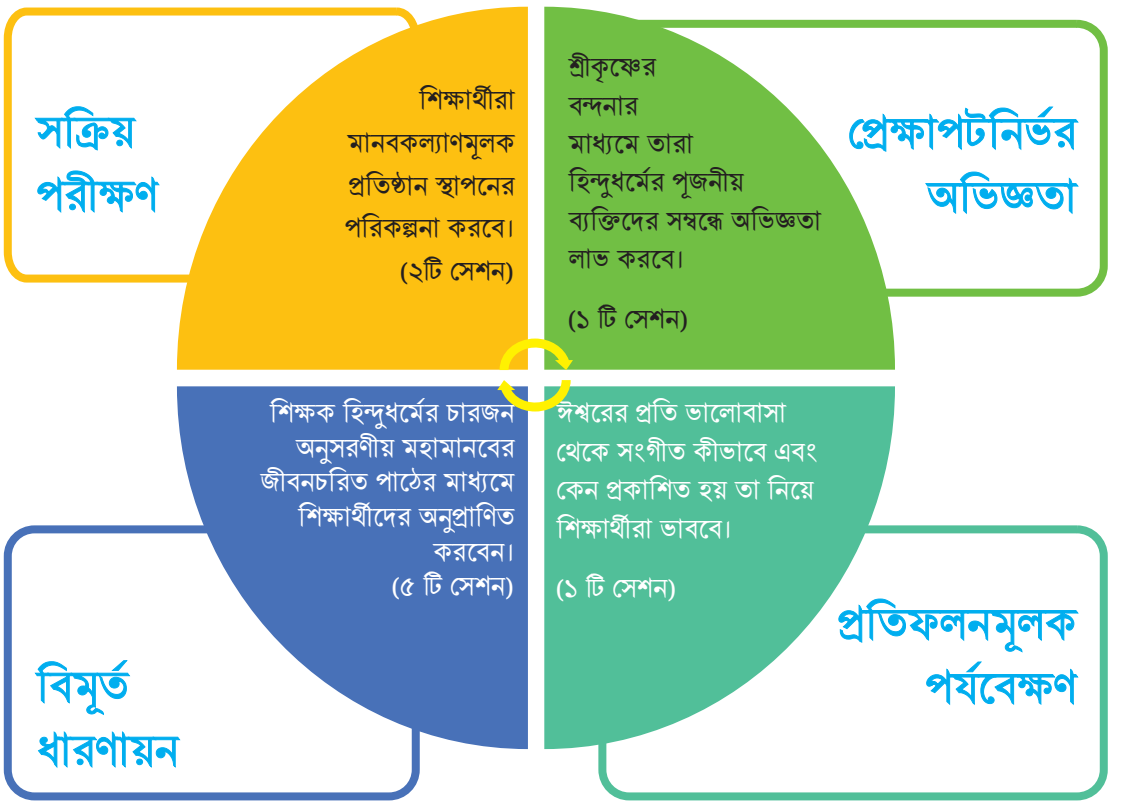

সেশন ১ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে নীচের কীর্তণটি গাইবেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন যে তারা শ্রীকৃষ্ণ-কে নিয়ে আর কোন গান জানে কি-না। যদি কোনো শিক্ষার্থীর কোনো গান জানা থাকে, তবে শিক্ষক ঐ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে গানটি সবার সাথে গাইবেন।
- শিক্ষক বলবেন যে শিক্ষার্থীরা যাতে বাড়ি থেকে শ্রীকৃষ্ণের কোন গান জেনে বা শিখে আসে, যাতে পরবর্তী সেশনে একসাথে গান গাওয়া যেতে পারে।

সেশন ২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের শিখে আসা গান, শিক্ষক সকলের সঙ্গে গাইবেন।

- শিক্ষক বলবেন, "এই যে কীর্তন এবং তোমাদের শিখে আসা গান আমরা গাইলাম, বলো তো এরকম মধুর গান কীভাবে রচিত হয়?"
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে শিক্ষক কয়েকটি pointer-এর মাধ্যমে আলোচনাটি গতিশীল করতে পারেন। কয়েকটি নীচে দেওয়া হলো।
    - এমন গান যারা লেখেন তারা ঈশ্বরের সমীপে নিজেকে নিবেদন করেছেন। এ গানগুলো সেই নিবেদনার বহিঃপ্রকাশ।
    - এমন গান ঈশ্বরকে ভালো না বাসলে লেখা যায় না
    - এমন গান আমরা লিখতে পারবো যদি আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ভালোবাসা ঈশ্বরের করকমলে রাখতে পারি
- শিক্ষার্থীদের আলোচনার এ পর্যায়ে শিক্ষক বলবেন, "তোমাদের ভাবনাগুলো আসলেই দারুণ! ঈশ্বরকে ভালো না বাসলে এরকম শ্রুতিমধুর গান আমরা পেতাম না।"

সেশন ৩-৭ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষক বলবেন, "এরকম ঈশ্বরপ্রেমে যারা নিজেদেরকে নিয়োগ করেছেন তাদের কয়েকজন সম্বন্ধে আমরা জানব।" প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে শিক্ষক এই মহামানবদের জীবনী তুলে ধরবেন।

মীরাবাঈ

মীরাবাঈ ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঠোর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রত্নসিংহ এবং মাতা বীর কুঁওরী। মীরা ছিলেন তাঁর পিতা মাতার একমাত্র আদরের সন্তান। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'মিহিরা'। তাঁর লেখা ভজনে তিনি নিজেই তাঁর নাম পাল্টে রাখেন মীরা।

মীরাবাঈর শৈশব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটি মীরার জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার

করে। একবার তাদেঁর বাড়ির সামনে দিয়ে একটি বিয়ের উৎসবে বরযাত্রিসহ বর যাচ্ছে। তখন ছোট মীরা তাঁর মাকে বলেছিলেন-"মা আমার বর এমন করে কবে আসবে ?" মেয়েকে শান্ত করার জন্য মা বলেছিলেন, "ওরে তোর বর তো ঘরেই আছে । ঠাকুর ঘরে চলে যা গিরিধারী গোপালজীকে দেখ ,উনিই তোর বর । ওনার সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে"। এই কথা শুনে মীরাবাঈ ভেবেছিলেন সত্যিই গিরিধারী গোপালাই তাঁর বর। গিরিধারীকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তিনি। এভাবেই তাঁর মা অজ্ঞাতসারে মেয়ের মনের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করলেন।

মাত্র আট বছর বয়সে মীরা তাঁর মাকে হারান। সে সময় মাতৃহারা মীরাকে নিয়ে তাঁর পিতা খুবই বিপদের মধ্যে পড়েন। তখন তাঁর ঠাকুরদা রাও দুধাজী মিরাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। ঠাকুরদার রাজপ্রাসাদে মীরার শৈশব কাটতে থাকে। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তিনি প্রাসাদের কাছে একটি চতুর্ভুজজীর মন্দির তৈরী করেছিলেন। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় আলোচনা করতেন। একবার এক সাধু মীরাকে গিরিধারী গোপালের একটি বিগ্রহ দেন। এই বিগ্রহের সেবা পূজা করেই মীরার সময় কাটত। তিনি প্রিয় গোপালকে নিজের লেখা গান শোনাতেন। ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

মীরার বয়স যখন আঠারো বছর। তখন চিতরের রানা সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজরাজ সিংহের সঙ্গে মীরার বিয়ে হয়। দাম্পত্য জীবন যাপনের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিলনা তাঁর। মীরাবাঈ চিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শুরু হয় বৈষ্ণব আরাধনা। ভোজরাজ স্ত্রীর মনের কথা বুঝতে পেরে তাঁর জন্য একটি কৃষ্ণ মন্দির নির্মান করে দেন। বিবাহিত জীবনের কয়েক বছরের মধ্যেই মীরা তপস্বিনী মীরাবায়ে পরিনত হন। সমস্ত রাজ্যে মীরার সাধন ভজনের কথা ছড়িয়ে পড়ল। চিতরের সাধারন মানুষের চোখে তিনি হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ সাধিকা মীরাবাঈ। মীরার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত এবং প্রেম সাধনার কথা প্রচারিত হলো সর্বত্র।

রাজ পরিবারের অনেকেই মীরার এই জীবন যাত্রাকে মেনে নিতে পারেননি। এ অবস্থায় হঠাৎ করে তাঁর স্বামী ভোজরাজ সিংহ মারা যান। তখন চিতরের নতুন রানা হন বিক্রমজিৎ সিং। তিনি মীরাকে মারার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই গিরিধারীর কৃপায় মীরা রক্ষা পান। শেষ পর্যন্ত মীরা তাঁর পিতৃগৃহ মেড়তায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানেও তাঁর ঠাঁই হয় না। তাঁর কাকার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের কারণে মীরা চলে যান বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে শ্রী কৃষ্ণের প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

অতঃপর একদিন তিনি বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করেন। এবং কৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দ্বারকা ধামে এসে রণছোরজীর বিগ্রহের ভজন-পূজনেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান। এই দ্বারকা ধামেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণভক্ত মীরাবাঈ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়ার পথ দেখান। তাঁর রচিত ভজন সঙ্গীত এবং ভগবৎ সাধনা এক নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গেছে। তাঁর দেখানো এই নতুন পথ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। এই সম্প্রীতি যে মিলনধারায় প্রকাশ পায় তার নাম 'ভক্তিবাদ'। ভক্তিবাদের মূল উদ্দেশ্য সকল শ্রেণির মানুষকে সমান চোখে দেখা।ভক্তিবাদ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল নবম শতকে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত উচ্চবর্ণের পুরুষদের থেকে পূজার অধিকার নিয়ে নিয়ে বর্ণের সকলের মধ্যে বন্টন করা। এবং সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র পাঠের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষায় গান ও কবিতা রচনা করে আরাধ্য দেবতার উপাসনা করা।

মীরাবাঈর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পায় যে, যাঁরা প্রকৃত সাধক তাঁরা কখনো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ

করেন না। এঁরা জাগতিক সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে যান। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্প্রীতির বাধনে বেঁধে রাখেন। দৈহিক জগতের মোহ ত্যাগ করে তাঁরা শুধু একাগ্র চিত্তে সাধনা করেন। আমরাও এদের মতো সর্বদা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করব । কর্তব্য কর্মে কোনো অবহেলা করব না। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।জ্ঞানের আলো দিয়ে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করব।

প্রভু নিত্যানন্দ

প্রভু নিত্যানন্দ ১৪৭৩ সালে বীরভুম জেলার একচক্রা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হারাই পন্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী।তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কুবের । গ্রামের পাঠশালায় তাঁর লেখা পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।কিন্তু ছেলে বেলা থেকেই লেখাপড়ার চেয়ে ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বেশি।তাঁর বয়সী ছেলেরা যখন খেলাধূলায় ব্যস্ত তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন।তিনি ছোট বেলা থেকেই রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলোর অভিনয় করতেন।সারাক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। কী করলে শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যাবে এটাই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের ভাবনা।

কুবেরের বয়স তখন বারো বছর। একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁদের বাড়িতে এলেন। কুবের তখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার বায়না ধরেন। কুবের নছোড়বান্দা তিনি সন্ন্যাসীর সাথে বৃন্দাবনে যাবেনই।কেননা তিনি যানতেন বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র।অবশেষে পিতামাতার সম্মতি মিলল। তিনি সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করলেন। তাঁরা দুজনে একত্রে বহু তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ কুবের একদিন সন্ন্যাসীকে হারিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি একাই বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান।এভাবে একদিন তিনি উপস্থিত হলেন কাঙ্খিত বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর দেখা হয় পরম সন্ন্যাসী শ্রীপাদ মানবেন্দ্রপুরীর সাথে। তাঁর কাছ থেকে তিনি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা নেন। তিনি কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর থাকেন। শ্রীহরির চিন্তায় তাঁর দিন কাটতে থাকে। হঠাৎ একদিন তিনি কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখতে পান। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নবদ্বীপে যাওয়ার আদেশ দেন। এরপরেই তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপের পথে রওনা হলেন।এখানে তাঁর সঙ্গে নিমাই পন্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা দুজনে মিলে যেন এক হয়ে যান। জীবোদ্ধারের জন্য যেন দুই দেহে তাঁদের আর্বিভাব ঘটেছে। সেদিন থেকে কুবেরের নতুন নাম হলো নিত্যানন্দ। সংক্ষেপে নিতাই। আর গৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত নাম গৌর। ভক্তরা সংক্ষেপে বলতেন গৌরনিতাই।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাঁরা উভয় মিলে হরিনামে মেতে ওঠেন। তাঁরা সকল শ্রেণির মানুষের কাছে বৈষ্ণব মত প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের প্রেমধর্মে ছিলনা কোনো জাতিভেদ বা উঁচুনিচু ভেদাভেদ। যখন শুদ্ধাচরণের নিচে চাপা পড়েছিল মানবপ্রেম তখনই প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোক তাঁদের অনুসারী হতে লাগলেন।

নবদ্বীপে তাঁরা নেচে গেয়ে হরিনাম বিলাতে লাগলেন। সেই সময় নবদ্বীপে জগাই-মাধাই নামে দুই ভাই নগর কোতোয়ালের কাজ করত। তাঁরা ছিল মদ্যপ ও হরিবিদ্বেষী। যে কোনো অন্যায় কাজ করতে তারা দ্বিধা করত না। গৌরনিতাই প্রেমভক্তি দিয়ে জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন। এদের দুই ভায়ের জীবন সম্পূর্ন পাল্টে যায়।তারাও তখন নবদ্বীপে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে যান। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশ মত গৌরে গিয়ে বিদ্বান, মুর্খ, চন্ডাল,ধনী, দরিদ্র সকলের মধ্যে হরিনাম আর প্রেমধর্ম বিতরণ করতে লাগলেন। তিনি সকলকে এক কৃষ্ণ নামে আবদ্ধ করলেন। সার্থক হলো তাঁদের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণ নামের আন্দোলন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গৌর বাসির অন্তরে চির অমর হয়ে

থাকেন।১৫৪২ সালে এই মহা সাধক ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষা ছিল এই যে, কোনো তর্কবিতর্ক ছাড়া ধর্মের কোনো বিচার বিশ্লেষণ না করেই তিনি সকলের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণ করেছেন। তিনি কখনোই ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করেননি। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করেননি। তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজ জীবনে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ সমস্ত কিছু ভুলে এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর কাছে এসে পরম শান্তি লাভ করত। এমনিভাবে অসংখ্য মানুষ প্রভু নিত্যানন্দের সংস্পর্শে এসে নবজীবন লাভ করেন। সার্থক হয় প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। আমরাও তাঁর মতো সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখব । মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করব না। সকলকে সম্পীতির বানে বেঁধে রাখব।

শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রচীন পন্থিদের ধর্মীয় গোড়াঁমি, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এদের হিংসার আস্ফালন গোটা সমাজ জীবনকে হতাশা গ্রস্থ করে তুলে। অশিক্ষা , কুশিক্ষা ও দারিদ্রতার নিস্পেষনে জর্জরিত মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ ভুলে দিশাহারা হয়ে পরে। ঠিক এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে পতিত পাবন হরি মানব মুক্তির অগ্রপথিক শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই মে এই ধরাধামে আবির্ভুত হন। তাঁর পিতা দীননাথ এবং মাতা বামা দেবী।

পন্ডতি দীননাথ চক্রবর্তী বাস করতেন পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহা পাড়া গ্রামে ।তিনি ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পন্ডিত। পান্ডিত্যের জন্য তিনি ন্যায়রত্ন উপাধী পেয়েছিলেন। একদিন সীতা নবমী তিথিতে ব্রহ্ম মুর্হুতে দীননাথ ও তার স্ত্রী বামাদেবী গঙ্গা স্নান করতে যান।

তারাঁ দেখলেন দিব্য জ্যোর্তিময় অনিন্দ্য সুন্দর একটি শিশু পদ্মফুলে ভাসতে ভাসতে তাঁদের সামনে এল। দীননাথ তখন শিশুটিকে তুলে বামাদেবীর কোলে দিলেন। প্রভু শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু দেখতে ছিল খুব সুন্দর। তাঁর গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত।

জগদ্বন্ধুর বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ মাস তখন তাঁর মা মারা যান। দীননাথ তখন এই ছোট শিশুটিকে নিয়ে তাঁর নিজের গ্রাম গোবিন্দপুরে ফিরে আসেন। তখন জগদ্বন্ধুর লালন পালনের ভার পড়ে তাঁর জেঠতুত বোন দিগম্বরী দেবীর ওপর। জগদ্বন্ধুর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর বাবাও মারা যায়। এর কয়েক মাস পর চক্রবর্তী পরিবার চলে আসেন ফরিদপুরের শহরতলী ব্রাহ্মণকান্দায়। জগদ্বন্ধু ফরিদপুর জেলা স্কুলে লেখা পড়া শুরু করলেও শেষ করেন পাবনা জেলা স্কুলে। পাবনা শহরের উপকণ্ঠে ছিল এক প্রাচীন বট গাছ। তার নিচে থাকতেন এক বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। মানুষ তাঁকে 'ক্ষ্যাপা বাবা ' বলে ডাকত। একদিন তাঁর সাথে জগদ্বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। জগদ্বন্ধুর সাথে তাঁর ভাব জমে যায়। জগদ্বন্ধু তাঁকে বুড়ো শিব বলে ডাকতেন। জগৎ অবসর পেলেই সেই বট গাছের নিচে গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। কিছুদিনের মধ্যে শহর ও শহরতলীতে তাঁর এক তরুন ভক্তদল গড়ে ওঠে।

প্রভু জগদ্বন্ধু একদিন ভক্তদের ছেড়ে তীর্থ ভ্রমনে বের হন। তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থান ও গ্রাম গঞ্জে হরিনাম বিলিয়ে উপস্থিত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর লীলাস্বাদন চলতে থাকে গভীর থেকে গভীরে। বৃন্দাবনে কিছু কাল থেকে তিনি ফিরে আসেন ফরিদপুরে। ফরিদপুরের উপকণ্ঠে ছিল নিম্ন শ্রেণির বুনো বাগদি, চন্ডাল, কোলভিল, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির বাস । এদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারপূর্ণ । মদ্যপান, গাঁজা সেবন এবং বিভিন্ন অসামাজিক কাজ ছিল তাদের নিত্য দিনের ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি,

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও হিংসা বিদ্বেষের কারনে তাদের ব্যাক্তি ও পারিবারিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এদের অনেকেই একটু সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে এবং দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । ঠিক সেই সময় জগদ্বন্ধুর কৃপাদৃষ্টি পড়ে এসব হতদরিদ্র ও অসহায় লোকেদের ওপর । তিনি বাগদিদের সর্দার রজনীকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেন। রজনী বলেন, 'আমরা নিচু জাতি। সবাই আমাদের ঘৃনা করে আর তুমি আমাকে বুকে টেনে নিলে'। প্রভু বললেন,'মানুষের মধ্যে কোনো উঁচু নিচু নেই। ভগবান মানুষের মধ্যেই আছেন। মানুষের মধ্যেই দেবতার অধিষ্ঠান। ছোট বড় ভেদাভেদ শুধু তার গুণের ও কর্মের । এই বৈষম্য শুধু মাত্র বর্ণগত ও জাতিগত হতে পারেনা'।সেদিন প্রভু সুন্দরের কৃপায় সাড়ে সাত হাজার বুনো বাগদি এবং সাড়ে পাঁচ হাজার ডোম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবেই তিনি বর্ণাশ্রিত শাসিত সমাজে প্রতিষ্ঠা করলেন মানবতার মূরৃতি।তিনি এসব বুনো বাগদিদের 'মোহন্ত' এবং ডোমপল্লীবাসীদের 'ব্রজজন' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভক্ত হরিদাস মোহন্ত অল্প দিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধ পদকীর্তনীয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ধীরে ধীরে যশোর , ফরিদপুর , বরিশাল প্রভৃতি জেলায় হরিনাম কীর্তনের এক অভুতপূর্ব সারা পরে গেল ।

প্রভু একদিন ভক্তদের নিয়ে ভ্রমনে বের হয়েছেন। ফরিদপুর শহরের এক জঙ্গালাকীর্ন জায়গায় এসে তিনি থমকে দাড়িঁয়ে বলেন," এখানেই আমি শ্রীঅঙ্গান প্রতিষ্ঠা করব"। সেই সময় শ্রীরাম কুমার মুদি নামক ভক্ত শ্রীঅঙ্গান প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন। প্রভুর নির্দেশেই ১৮৯৯ সালে ১৯.১১ একর ভ'মির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গান ।

মিস মেরী ,মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশ,তাঁর স্ত্রী বাসন্তি দেবী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মত বহু গুণীজন ও ভক্তানুরাগীর পদচারণায় মুখর হয়েছে এ পবিত্র তীর্থভ'মি শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গান।

এই শ্রীধাম শ্রঅঙ্গানেই শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা।১৯০২ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ১৬ বছর ৮ মাস ধরে চলে প্রভুর গম্ভীরা লীলা। এ সময় তিনি ছিলেন মৌনি। এর তিন বছর পর ১৯২১ সালে প্রভু সুন্দর এই শ্রীঅঙ্গানেই তাঁর ইহ লীলা সংবরণ করেন। প্রভুর মানব লীলা সংবরণের পরবর্তী মাস থেকেই এই শ্রীঅঙ্গানে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা

হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ

চারি হস্ত চন্দ্র পুত্র হা কীট পতন

প্রভু প্রভু প্রভু হে অনন্তানন্তময়।।

এই অখন্ড মহানাম কীর্তণ করা হয়। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। প্রভুর নাম কীর্তন করেই মানুষের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ হবে । এই গভীর বিশ্বাস থেকেই তাঁরা কীর্তন করেন। মানব মুক্তির অগ্রপথিক প্রভু শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দরের আরাধনা করে ১৯৭১ সালে ২১ শে এপ্রিল এই শ্রীধাম শ্রীাঙ্গানে আটজন সাধু 'বলো জয় জগদ্বন্ধু বোল' বলে কীর্তন করতে থাকেন। তখন পাকিস্তানি হানাদাররা এটাকে 'জয় বঙ্গাবন্ধু' ভেবে কীর্তণরত এই আটজন সাধুকে নির্মম ভাবে হত্যা করে।এই সাধুরাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুরের প্রথম শহীদ। পরবর্তীতে এই শ্রীঅঙ্গানে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মান করা হয়।

প্রভু সুন্দরের জীবনের দুটি দিক রয়েছে । একটি তাঁর আধ্যাত্মিক দিক । অন্যটি সমাজে পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষের জন্য তাঁর বন্ধুরূপে প্রকাশ। তিনি ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। এই কলিহত জীবকে উদ্ধারের জন্য তিনি এবং তাঁর ভক্তরা সর্বত্র হরিনাম কীর্তনের প্রচার করেন। এ কারনে তাঁকে নাম কীর্তনের দেবতাও

বলা হয়ে থাকে। প্রভুর আগমন বার্তা এবং হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মহানাম সম্প্রদায় । ২০ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। মহানাম সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণবাদ আন্দোলনকে পুনোরুজীবিত করা। এটি মানবতার পাঁচটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যথা : ১) চুরি না করা (২) হিংসা না করা (৩) সত্যবাদী হওয়া (৪) আত্মসংযমী হওয়া এবং (৫) অন্তরে এবং বাহিরে শুচি বা পবিত্র থাকা।

জগদ্বন্ধু বলেছেন,'এই মম এক ধর্ম জীব ভজন' অর্থাৎ প্রভু সুন্দর বার বার মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন।

শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু ছিলেন একজন পদকর্তা,বৈষ্ণব ধর্মগুরু এবং একজন সমাজ সংস্কারক । নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি বিশেষ সহানুভুতির জন্য তিনি জগদ্বন্ধু উপাধী লাভ করেন।

আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি অসহায় মানুষদের মর্যাদায় উন্নীত করাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।তাই তো তিনি বলেছেন,

মন প্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ
ক্ষমা, দয়া, ধর্ম, দান উদ্ধার বিধান।

অবদান: শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর মানবতার সেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । যা আজও অব্যাহত রয়েছে। তাঁর মানবসেবা মূলক সকল কর্মকান্ড মহানাম সেবক সংঘ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি মহানাম সম্প্রদায়ের একটি অঙ্গ সংগঠন। ১৯৮১ সালে এই প্রতিষ্ঠান শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু সেবাঙ্গন নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালায়। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে সাগর পারে 'গারোসাগর' নামে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহানাম সম্প্রদায় এখানে তীর্থ যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার আয়োজন করেন। তাঁরা এখানে অ্যাম্বুলেন্স সেবাও দিয়ে থাকে। এই সংগঠনটি প্রতি বছর শীতের মাসগুলোতে দরিদ্র ও অসহায় লোকেদের মধ্যে বিনামূলে কম্বল বিতরণ করেন। এদের নিজস্ব দুটি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে এরা দরিদ্র ও মেধাবী শির্ক্ষাথীদের বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রি বিতরণ করেন।

শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের ধর্ম পালন করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতেন। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের নিকটে দরবেশের জলা নামক একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে জমি দান করেন। তৎকালীন কমিশনার মজুমিয়ার কাছে এ জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগে মহানামব্রত ফাউন্ডেশন থেকে প্রতি বছর দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলাগুলোতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও কিছু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে । এরা দারিদ্রতা, শিক্ষার অভাব , মাদকদ্রব্য সেবন, স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী লোকের দৈরাত্য ইত্যাদি কারণে বিপথগামী হয়ে পড়ছিল। এই শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলের কিশোর ও যুবকদের জীবন যাত্রার যাবতীয় ব্যায় ভার বহন করা হয় । এদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের বাণি:

(১) মানুষ মন্ত্র দেয় কানে । জগদ্বন্ধু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

(২) কেউ মূর্খ থাকিও না । মুর্খ আমার কথা বুঝিতে পারিবে না। অজ্ঞানের হরি ভক্তি হয় না।

(৩) জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। কোনো জীবকে আঘাত করলে নিত্যানন্দকে আঘাত করা হয়।

(৪) এটা প্রলয় কাল , নাম সংকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেবল হরি নাম কর , হরি নাম কর ।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর 'শ্রীমতি সংকীর্তন','শ্রী শ্রী নাম সংকীর্তন','শ্রী বিবিধ সংগীত','শ্রী সংকীর্তন পদাবলী',' শ্রী শ্রী হরিকথা', 'ত্রিকাল',' উদ্ধারণ ' এবং 'চন্দ্রপাত' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শিক্ষা : প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সব মানুষ সমান , কেউ উঁচু- নীচু নয়। কোনো মানুষই ঘৃন্য বা অস্পৃশ্য নয়। তিনি যেমন তাঁর প্রেম ভক্তি দিয়ে যথেচ্ছ চন্ডাল থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষকে মানবধর্মে দিক্ষিত করেন। আমরাও তেমনি সকল মানুষকে ভালোবাসব । কারো মনে আঘাত দিব না। কারণ মানুষকে আঘাত দিলে সে আঘাত নিত্যানন্দকে বা ভগবানকে দেয়া হয়। পিতা মাতা হচ্ছেন পরম গুরু। তাঁদেরকে কষ্ট দিব না। তিনি শিক্ষা গ্রহনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমরাও জগদ্বন্ধুর কথা মেনে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করব। কাজের মধ্যে সর্বদা হরিনাম করব। পরর্চ্চা ও পরনিন্দা করব না ।এই শিক্ষাগুলো আমরাও আমাদের জীবনে মেনে চলব ।

স্বামী স্বরূপানন্দ

স্বামী স্বরূপানন্দ একজন প্রখ্যাত সাধক এবং সমাজ সংস্কারক। তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলা সদরের পুরাতন আদালত পাড়া। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে তাঁর জন্ম। প্রতি খ্রিস্টাব্দের শেষ মঙ্গলবার তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। তাঁর পিতা সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতা মমতা দেবী। প্রথমে তাঁর নাম ছিল বঙ্কিম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় স্বরূপানন্দ। বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। ছোটো বেলা হতেই তাঁর এই গুণের অনেক প্রকাশ দেখা যায়। এর মধ্যে ধ্যানমগ্নতা একটি। ছোটোবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল বল্টু । বল্টু সহপাঠীদেরকে ঈশ্বরীয় ভাবনার প্রেরণা দিত। মানবিক গুণের বিকাশেও উদ্বুদ্ধ করত। সুন্দর চরিত্রের জন্য সঙ্গীদের নিকট শৈশব হতেই তিনি প্রিয় ছিলেন। একবার সঙ্গীরা বল্টুর কাছে একটা নতুন খেলার আবদার করে। বল্টু সকলকে একসঙ্গে ধ্যান করতে বসাল। তারপর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ভগবানের নাম জপ করতে বলল। সকলেই নাম জপ শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই একে একে সবাই বাড়ি চলে গেল। এদিকে বল্টুর ধ্যান আর শেষ হয় না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। বল্টু বাড়ি ফিরল না। বাড়ির লোকেরা বল্টুর খোঁজে এসে দেখে সে গভীর ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান ভাঙিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। এই ধ্যান ও নামজপের চর্চা বল্টুর জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সুযোগ পেলেই বল্টু এটা করত। অন্যদিকে ছোটোবেলা থেকেই তার চোখে পড়ল সমাজের কুসংস্কার। দেখলেন মানবিক অবক্ষয়, বর্ণভেদ ইত্যাদি। এ অবস্থা দূরীকরণে তিনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। একদিকে আধ্যাত্মিতা, অন্যদিকে সমাজ সংস্কার। এ দুটো তাঁর সারা জীবনের ব্রত হয়েছিল।

সকল মানুষের জীবনে পরিবারের একটা প্রভাব থাকে। স্বরূপানন্দের ঠাকুরদাদার নাম ছিল হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়। সর্বমহলে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজহিতে নিজেকে উৎসর্গ করা একজন যোগীপুরুষ। পিতা ছিলেন স্বভাবকবি। দেশের মুক্তি আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। পিতা এবং পিতামহের সকল গুণের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনে। দেশে তখন ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন চলছে। নিজে রাজনীতিমুক্ত জীবন-যাপন করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীগণের প্রেরণার উৎস। স্বামী স্বরূপানন্দ জোর দিয়েছেন মানুষের চরিত্র গঠনের ওপর। তিনি বলতেন- ''মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

তার চরিত্রে।" তিনি চরিত্রগঠন নিয়ে অনেক ভেবেছেন। দেশের কিশোর এবং যুবকদের নির্মলচেতা হতে এবং শুভবুদ্ধি জাগাতে তিনি "চরিত্রগঠন আন্দোলন" কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি শুরু করেন স্বাবলম্বন কর্মসূচি। তিনি চাঁদপুর শহরের নিকটবর্তী ঘোড়ামারার মাঠে ১৯১৪ সালে চরিত্রগঠন আন্দোলনের সূচনা করেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনার উৎস ও মহাসমন্বয় এক ওঙ্কার সাধনার আজন্ম সাধক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "ওঙ্কার সর্ব মন্ত্রের প্রাণ, সর্ব মন্ত্রের সমন্বয় এবং সর্ব তত্ত্বের স্বীকৃতি।" তাঁর একটি বড়ো কৃতিত্ব একসঙ্গে সকলের জন্য ভগবানের আরাধনার সমান সুযোগ করে দেওয়া। সকল শ্রেণির জন্য তিনি সমবেত প্রার্থনার প্রবর্তন করেন। এই সমবেত উপাসনায় ভক্তগণ সমকালে, সমমন্ত্রে, সমাসনে বসে এক ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। সমবেত উপাসনায় বর্ণভেদ বা ছোটো-বড়ো শ্রেণিবৈষম্য থাকে না। বিশেষ পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই, নেই উপাসনালয়। এ সমবেত প্রার্থনায় সকলে মিলে এক হয়। সকলে মিলে সবার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বিশ্বের মঙ্গল কামনা করা হয়। তিনি জানতেন, স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কাজে সফল হওয়া যায় না। তাই তিনি সুস্বাস্থ্য গঠনে যৌগিক আসন-মুদ্রার ব্যাপক প্রচার করেছেন। সামাজিক সুস্থতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রচার করেছেন তিনি। নৈতিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে তিনি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় অজস্র ভাষণ প্রদান করেছেন। লোককল্যাণে তিনি সকলকে স্বাবলম্বণ করার ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, ভিক্ষাবৃত্তি সম্মানহানিকর। ভিক্ষুকের কোনো মর্যাদা নেই। পরহিতে তিনি ত্যাগের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কৃষির প্রসারে তিনি আধুনিক কৃষি-শিক্ষার কথা বলেছেন। অগণিত ফলদবৃক্ষ, সবজির চারা, কৃষিবীজ বিতরণ করেছেন তিনি। দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়নে তিনি আয়ুর্বেদ ঔষধ তৈরির বিশাল প্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। ভালো মানুষ গড়ার একান্ত লক্ষ্য ছিল তাঁর। তিনি পরনির্ভরতামুক্ত আদর্শ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন। বন-পাহাড়ের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনের মানোন্নয়নে তিনি সুবিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তিনি জনসেবার অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৯৮৪ সনের ২১ শে এপ্রিল স্বামী স্বরূপানন্দ কলকাতায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

স্বরূপানন্দের জীবনী থেকে আমরা নানামুখী শিক্ষা পাই। আমরা পাই যথার্থ মানুষ গড়া এবং জনকল্যাণমূলক কাজের প্রেরণা। যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন চরিত্রগঠন ও নৈতিক শিক্ষা। জনকল্যাণমূলক কাজে চাই স্বাবলম্বী হওয়া, কৃষির উন্নয়ন। সুস্থ সমাজগঠনে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি ও জাতিভেদ ও বর্ণভেদ দূরীকরণ। স্বরূপানন্দের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে নির্মিত হয়েছে 'অযাচক আশ্রম'। তাঁর অনুসারীরা 'অখন্ডমন্ডলী' নামে পরিচিত। অনুসারীদের কাছে তিনি 'অখন্ডমন্ডলেশ্বর'। আধ্যাত্মিক সাধনায় স্বরূপানন্দ সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু সবার উপরে তিনি জনসেবাকে স্থান দিয়েছেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের কয়েকটি বাণী :

- একের মাঝে সবাই আছে, তাই ত একের উপাসনা।
- কর্মই ব্রহ্ম।
- অভিক্ষাই নবযুগের সাধনা।
- স্বাবলম্বনই শক্তিমানের পরিচয়পত্র।
- মনুষ্য জন্মের সার্থকতা ভগবানে ভালোবাসা।
- নিখিল বিশ্বকে আপন করিবার সাধনার নাম হিন্দুধর্ম।
- জাতিবৈর নির্মূল হোক।
- উদারতাই মনুষ্যত্বের ভিত্তিভূমি।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনা জেলার হেমায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ১২৯৫ সালের ৩০শে ভাদ্র (ইংরেজি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর) শুক্রবার শুভ তালনবমী তিথিতে শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর ঘরে মাতা মনোমোহিনী দেবীর কোলে জন্ম নেন। শুভদিনে মাতা মনোমোহিনী দেবী নিজ পুত্রের নাম রাখেন অনুকূলচন্দ্র। অনুকূলচন্দ্রের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আর মাতা মনোমোহিনী দেবী ছিলেন অত্যন্ত ইষ্টপ্রাণ একজন নারী।

পাবনার হেমায়েতপুরই অনুকূলচন্দ্রের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। পাঁচ বছর বয়সে ভগবান শিরোমণি আর সূর্য শাস্ত্রীর নিকট বালক অনুকূলচন্দ্রের হাতেখড়ি সম্পন্ন হয়। প্রথমে কাশীপুর-হাটতলায় কেষ্ট বৈরাগীর পাঠশালায় তিনি পাঠ গ্রহণ শুরু করেন। পরে তিনি পাবনা ইনটিস্টিউশনে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপরে তিনি পড়াশোনা করেন পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতিও নেন। এর মধ্যে তিনি জানতে পারেন, তাঁরই এক সহপাঠী টাকার অভাবে পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না। এগিয়ে এলেন অনুকূল। নিজের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি দিয়ে দিলেন বন্ধুকে। সেবার আর তাঁর পরীক্ষা দেয়া হলো না। অনুকূল পাশ করলেন পরের বছর। মায়ের ইচ্ছায় এরপর তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। এখানে তিনি স্থানীয় কুলিমজুরদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। চিকিৎসা বিদ্যা শেষ করে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। এসেই তিনি গ্রামের গরিব-দুঃখী মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, মানুষের দুঃখ দূর করতে হলে শুধু শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে। এভাবে সারাজীবন তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই অনুকূলচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত। মাতৃ-আজ্ঞা পালনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তিনি তাঁর বাণীতে বলেছেন, ‘‘মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত।” পিতার প্রতিও ছিল তাঁর সমান শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ। একবার পিতার অসুখের সময় সংসারে খুব অভাব-অনটন দেখা দিল। বালক অনুকূলচন্দ্র তখন নিঃশঙ্কচিত্তে সংসারের হাল ধরেছেন। তিনি তখন প্রতিদিন আড়াই মাইল পথ পায়ে হেঁটে শহরে গিয়ে মুড়ি বিক্রি করতেন। আর উপার্জিত অর্থ দিয়ে বাবার জন্য ঔষধ-পথ্য ও সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে মায়ের হাতে তুলে দিতেন। এভাবে তিনি পিতামাতাকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নিরন্তর ভালোবেসেছেন। তিনি বলেছেন, “পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্যপ্রাণ।” অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সমাজের অসহায় অবহেলিতদের বন্ধু। তাদের নিয়ে তিনি কীর্তন দল গঠন করেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিক শান্তির বিধান করেন। অনেক শিক্ষিত তরুণও এগিয়ে আসেন। তাঁর এই কীর্তন এক সময় একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সবাই তাঁকে তখন ডাক্তার না বলে ‘ঠাকুর’ বলে ডাকত। সেই থেকে তিনি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নামে পরিচিত হন। তাঁর খ্যাতি ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে, সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মানুষের কল্যাণের জন্য পাবনার হেমায়েতপুর গড়ে তোলেন সৎসঙ্গ আশ্রম। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্তয়নী ও সদাচার-এই পাঁচটি সৎসঙ্গের মূলনীতি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র বিহারের দেওঘরে যান এবং সেখানে একটি আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যসম্প্রদায় এবং সৎসঙ্গের কর্মকান্ড উভয় বাংলার নানা অঞ্চলে আজও সক্রিয়। ঢাকা, পাবনা, সিলেট, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সৎসঙ্গ আশ্রম ও মন্দির এর মাধ্যমে জনগণকে নানারকম সেবা দেওয়া হয়। অনুকুল ঠাকুরের উদ্যোগে বহু প্রতিষ্ঠান এবং তার শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন তপোবন বিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব কল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃ সদন, সৎসঙ্গ কৃষি ব্যাংক, দাতব্য চিকিৎসালয়, সৎসঙ্গ প্রেস ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠান দক্ষ-শিক্ষিত-স্বাবলম্বী জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

'সত্যানুসরণ' গ্রন্থটি ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত। এ ছাড়া তাঁর বাণীসম্বলিত পু-ণ্য-পুথিঁ, পথের কড়ি, অনুশ্রুতি, চলার সাথী, নারীর নীতিসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর ৩০শে ভাদ্র অসংখ্য ভক্তের মিলনে ঠাকুরের পুণ্য জন্মভুমি হেমায়েতপুরে পবিত্র গঙ্গা স্নান উৎসব পালিত হয়। তিনি ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে অমৃতলোকে গমন করেন। শিক্ষা বিষয়ে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কিছু অমিয় বাণী হলো:-

১. অভ্যাস, ব্যবহার ভাল যত
শিক্ষাও তা'র জানিস্ তত।

২. মুখে জানে ব্যবহারে নাই
সেই শিক্ষার মুখে ছাই।

৩. শুধু পড়াতেই হয় নাকো পাঠ
হাতে কলমে করা চাই
হাতে কলমে করবে যত
সত্ত্বায়ও ফুটবে তেমনি তাই।

৪. সাধু সেজ না, সাধু হও।

৫. অন্যে বাঁচায় নিজে বাঁচে,
ধর্ম বলে জানিস তাকে।

শিক্ষা: ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা ছিল মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। যে যে-সম্প্রদায়েরই হোক না কেন মনে রাখতে হবে ঈশ্বর এক, ধর্ম এক। সংসারে থাকবে, মন রাখবে ভগবানে। শুধু লেখাপড়া করলেই বড়ো হওয়া যায় না, আচার-ব্যবহার জানতে হয়। শিষ্টাচার, সততা, সময়ানুবর্তিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সদাচার প্রভৃতি নৈতিকমূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। সব সময় মানবসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে

হবে। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এইসব শিক্ষা স্মরণ রেখে আমরা পথ চলব এবং জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

সেশন ৮-৯ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, "এসব আদর্শ মহামানবদের কার্জক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি যদি কোনো মানব-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাও সেটার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে?"
- শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনাটি নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত ঘরে লিখবে।
- লিখিত অংশটি (পরবর্তী সেশনে) শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই চমৎকার ভাবনার জন্য সাধুবাদ জানাবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা: ৮

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা-চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। ৮ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

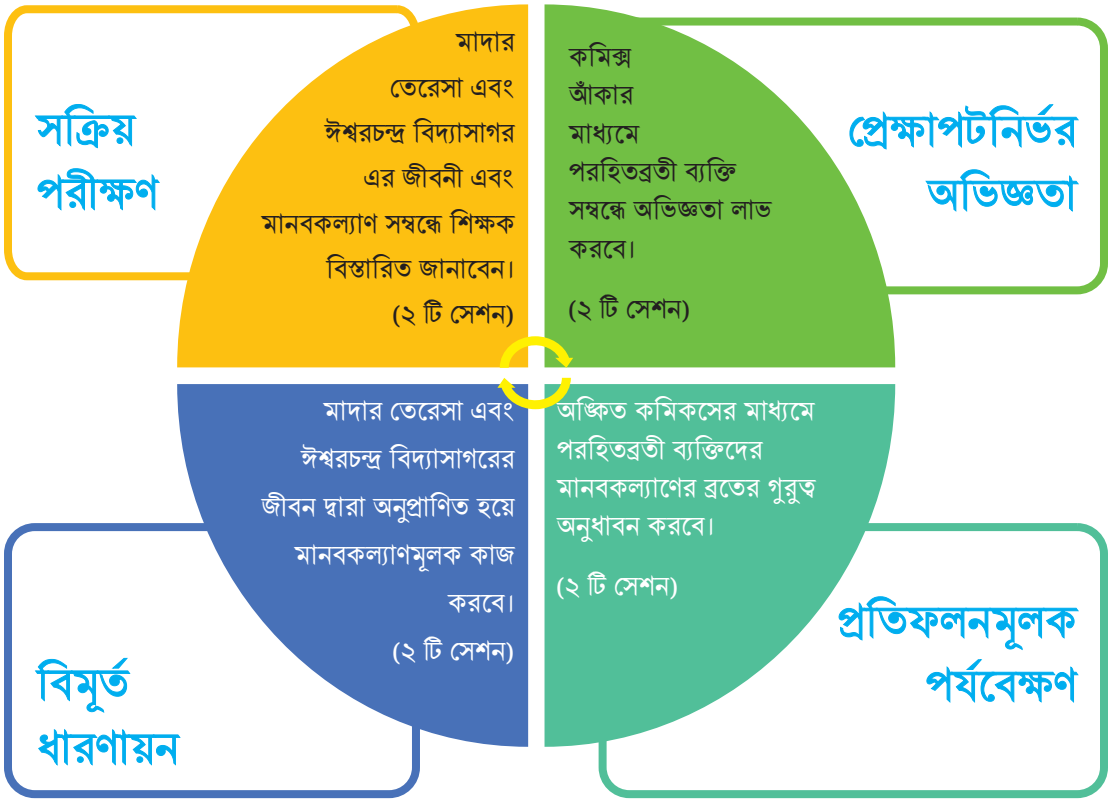

সেশন ১-২ প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর একটি প্রতিকৃতি দেখাবেন।
- এরপর শিক্ষক বলবেন, “এই যে প্রতিকৃতি দেখলে, এখন পরের তিনটি প্যানেলে/ঘরে নিজের কল্পনা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কে নিয়ে তোমাদের কমিক্স আঁকতে হবে। প্রতি ঘরে একটি করে দৃশ্যর কথা বলা আছে যার উপর ভিত্তি করে ছবিটি আঁকবে।”

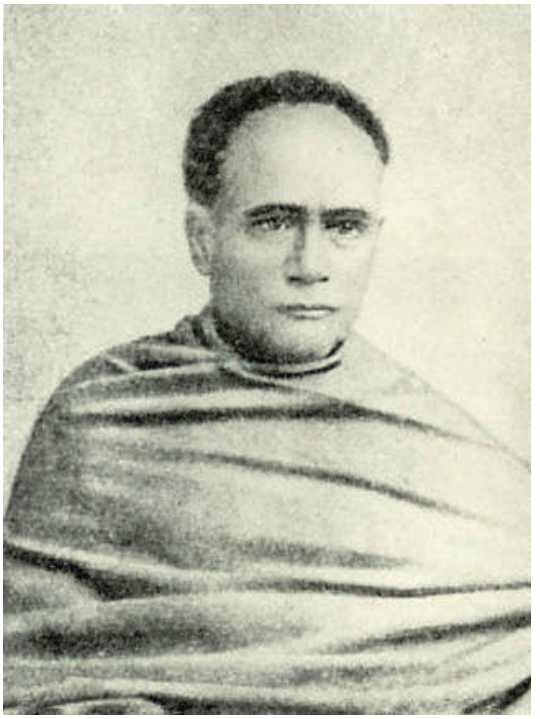 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	এখানে নিচের বিষয়ের উপরে ছবি অঙ্কন কর: মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন
এখানে নিচের বিষয়ের উপরে ছবি অঙ্কন কর: দরিদ্রদের সাহায্য করা	এখানে নিচের বিষয়ের উপরে ছবি অঙ্কন কর: বর্ণপরিচয় বই প্রণয়ন ও প্রকাশ

- একইভাবে শিক্ষক মাদার তেরেসা-কে নিয়েও কমিক্স আঁকতে বলবেন।

সাধ্বী মাদার তেরেজা

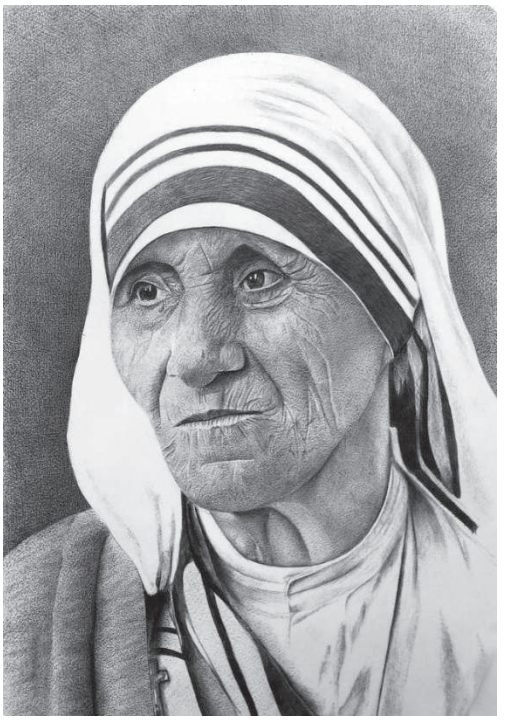

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন কর

১. দরিদ্র এলাকায় শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা

২. অনাথ আশ্রম পরিচালনা

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন কর

১. হাসপাতালে অসুস্থ মানুষদের সেবাকাজ

২. মিশনারিজ অব চ্যারিটি স্থাপন

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন কর

১. শিশুদের জন্য খাবার পরিবেশন

২. এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগীদের সেবা

সেশন ৩-৪ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কাজের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে ছবি অঙ্কন কেমন মজা হয়েছিল? তাদের অভিব্যক্তি ভালো করে শুনুন।

- শিক্ষার্থীদের দু'টি দলে ভাগ করুন। একটি দলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন-প্রবাহ ও অন্য দল মাদার তেরেসার জীবন-প্রবাহ নিয়ে তিনটি বিষয় পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাদার তেরেসা যে কাজগুলো করেছেন, সেই কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ অনেক উপকার পেয়েছে।

- তারপর তাদের লেখাগুলো শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে দিতে বলুন।

- শিক্ষার্থীরা এক দলের কাজ অন্য দল পরিদর্শন করবে। অন্য দল থেকে যদি নতুন কোনো ধারণা পাওয়া যায় তাহলে তা নিজের দলগত লেখার সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে। পরে প্রত্যেক দল শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

সেশন ৫-৬ বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষক কমিক্স আঁকার মাধ্যমে বরেণ্য ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের অনুধাবন করালেন, তার প্রেক্ষিতে দুইজন পরহিতব্রতী ব্যক্তিদের জীবনী আরো গভীরভাবে ধারণা দেবেন।

সম্প্রীতি

ঠাকুর শ্রী চৈতন্য দেব বলেছেন, "জীবে প্রেমের মাধ্যমেই আসল অভীষ্টপূর্ণ হয়। সকলের প্রতি ভালোবাসা প্রদান না করলে কখনো আমরা ঈস্পিত লক্ষে পৌছাতে পারব না। মানুষে মানুষে তুচ্ছ ভেদাভেদ দূর করতে হবে। মানুষ এই জগতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।"

স্বামী পরমানন্দ বলেছেন,

"যা মানবতা বিরোধী তাই পরিত্যাজ্য

মানবের সাধনা হোক মনুষ্যত্ব লাভ।

সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি"

অর্থাৎ এ জগতের সকল প্রাণির ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সনাতন বা হিন্দু ধর্ম কোনো বিশেষ প্রাণি বা ধর্মের লোকের জন্য প্রার্থনা করে না। বিশ্বে সকল জাতি বর্ন ও ধর্মের কল্যাণই হিন্দু ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

চণ্ডীদাস বলেছেন, "সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই।"

অথর্ব বেদের উনবিংশ কাণ্ডে বলা হয়েছে,

"দেবমাতা অদিতি কর্মের সাথে আমাদের শান্তি প্রদান করুক। অন্তরিক্ষ আমাদের হিত সাধন করুক। বায়ু আমাদের শান্তি দিক। বৃষ্টিপ্রদ গজর্নাদেব আমাদের কল্যাণ করুক। বাগদেবী সরস্বতী স্থিতির সাথে আমাদের শান্তি প্রদান করুক।"

অথর্ব বেদে দেবমাতা অদিতি, বায়ু, সরস্বতী দেবী এদের সকলের কাছে জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সনের ২৬ সেপ্টেম্বর ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ও মাতার নাম ছিল ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক।

সেবামূলক কাজ : তিনি অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের সেবা ও কল্যাণ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তাঁকে বলা হয় নারীশিক্ষা প্রসারের পথিকৃৎ। তাঁর উদ্যোগে ভারতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তিনি শুধু নারীশিক্ষায় উদ্যোগ নেননি, সবার শিক্ষার জন্যও তিনি নিবেদিত ছিলেন। সবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে সবার জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায়ও সকল মানুষের শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য তিনি কাজ করেন। এসব স্কুলে পড়ানোর জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণার্থে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ভারতেবর্ষে বিধবা-বিবাহ ও নারী শিক্ষার প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম বাল্য-বিবাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িতের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের জনক। তিনি বাংলা লিপি সংস্কার করেন এবং যুগান্তরকারী শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তি। সোমপ্রকাশ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি তার এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের ধনী-দরিদ্র, শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে গিয়েছেন।

পুরস্কার ও অভিধা : জনহিতকর কর্মের জন্য তিনি 'দয়ার সাগর', পান্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

মৃত্যু : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সনের ২৯ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

মাদার তেরেসা

জন্ম: মাদার তেরেসা ২৬শে আগষ্ট, ১৯১০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়'তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভত।

আহ্বান: ১২ বছর বয়সে মাদার তেরেসা ঈশ্বরের কাজের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে খ্রীষ্টের কাজ করার জন্য একজন ধর্মপ্রচারক হতে হবে। ১৮ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে ও পরে ১৯২৯ সালে ভারতে আইরিশ নান সম্প্রদায়ের "সিষ্টার্স অব লরেটো" সংস্থায় যোগদান করেন। ডাবলিনে কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভারতে ১৯৩১ সনের ২৪শে মে সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন পরে ১৯৩৭ সালের ১৪ মে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।

সেবা কাজ: মাদার তেরেসা কলকাতার বস্তিতে দরিদ্রতম দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করেন। যদিও তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলনা। তিনি বস্তির জন্য একটি উন্মুক্ত স্কুল শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর তেরেজা "ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ" করার জন্য ভ্যাটিকানের অনুমতি লাভ করেন। এ সমাবেশই পরবর্তীতে "দ্য মিশনারিজ অব চ্যারিটি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" হল একটি খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারণা সংঘ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে তিনি "নির্মল শিশু ভবন" স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল এতিম ও বসতিহীন শিশুদের জন্য এক ধরণের স্বর্গ। ২০১২ সালে এই সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন ৪,৫০০ জনেরও বেশি সন্ন্যাসিনী। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তার এই ধর্মপ্রচারণা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে যেমন- বন্যা, মহামারী, দূর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নেশা, গৃহহীন,পারিবারিক পরামর্শদান, অনাথ আশ্রম, স্কুল, মোবাইল ক্লিনিক ও উদ্বাস্তুদের সহায়তা ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০ এর দশকে ভারত জুড়ে এতিমখানা, ধর্মশালা এবং কুষ্ঠরোগীদের ঘর খুলেছিলেন। তিনি অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তার নিজের ঘর খুলে দিয়েছিলেন। তিনি এইডস আক্রান্তদের যত্ন নেয়ার জন্য একটি বিশেষ বাড়িও তৈরি করেছিলেন। মাদার তেরেজার কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। তার মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি দেশে মৃত্যু পথযাত্রী এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।

পুরস্কার: মাদার তেরেসা ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে "ম্যাগসেসে শান্তি পুরস্কার" এবং ১৯৭২ সালে "জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার" লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সনে "বালজান পুরস্কার" লাভ করেন। মাদার তেরেসা ১৯৭৯ সনে দুঃখী মানবতার সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ "নোবেল শান্তি পুরস্কার" অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন" লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে "প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কার" লাভ করেন। ২০১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস তাকে "সন্ত" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ক্যাথলিক মিশনে তিনি "কলকাতার সন্ত তেরিজা" নামে আখ্যায়িত হন।

মৃত্যু: তিনি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ ৮৭ বছর বয়সে কলকাতার পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

সেশন ৭-৮ সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের বলুন, দু'জন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁরা একই রকমভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন, সকলের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সকল ধর্মই আসলে সম্প্রীতির কথা বলে।
- শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর জীবন থেকে তাদের কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। অনুরূপভাবে মাদার তেরেসা'র জীবন থেকে তাদের কোন বিষয়টি

সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাদের উভয়ের জীবন থেকে একটি করে কাজ নিজে বা সহপাঠীদের সাথে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করুন। উপস্থাপনে যদি কোনো সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করুন।

- উপস্থাপন দিনে ক্রমানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উপস্থাপন দেখুন। উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা করতে সুযোগ দিন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন।

মেট্রোরেল (নির্মাণাধীন)

"বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল"

এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল সিস্টেম। এই মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এবং তা দুইদিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দ্রুত পৌঁছানো যাবে এবং তা যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং পরবর্তীতে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ চলমান আছে। এছাড়া আরও পাঁচটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৭ম শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ
- শ্রী রামকৃষ্ণ

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য